ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর

জ্যোতিকুমার চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩২২

— সাড়ে চার টাকা —

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলিকাতা ৯ হইতে বিভাসকুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

গত বছরের কথা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। বর্ষার প্রায় শেষ। শরতের গাঢ় নীল আকাশ মাঝে মাঝে উঁকি মারে। সাদা সাদা মেঘের ভেলা ভেসে চলে। আকাশে বাতাসে হিমালয়ে ফেরবার ডাক শুনি।

যাত্রার আগে সপ্তাহখানেকের জন্যে কলকাতায় আসি। পৌঁছুতেই টেলিফোনে ডাক এলো। অপরিচিত কণ্ঠ। নিজের পরিচয় দেন, একটি বিখ্যাত শিল্প সংস্থার এঞ্জিনিয়ার। কাশীপুর থেকে বলছেন। একবার দেখা করতে আসবেন। হিমালয়-পথ সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে।

পরদিনই আসেন। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা। চোখে চশমা। ফরসা রঙ। সবল দেহ। কথাবার্তায় উৎসাহের ফোয়ারা ছোটে। বলেন, এলাম আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে। চাকরিতে আজকাল ছুটি পাওয়াই মুশকিল। কিন্তু কোনও রকমে ব্যবস্থা করতে পারলেই বার হয়ে পড়ি—ঘুরতে। দশদিন পরে 'ভারত-দর্শন' স্পেশাল ছাড়ছে। ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়ে আনবে। তার একটা টিকিট কিনেছি। কিন্তু, এখন মন টানছে হিমালয়। ইতিমধ্যে হিমালয় পথের বই পড়লাম। স্থির করেছি, ভারত-দর্শনের টিকিট ফেরত দেবো। যেতে চাই হিমালয়ের কোন অংশে—পায়ে হেঁটে। সৌখিন হিল স্টেশনে নয়। সত্যিকার পরিচয় করতে চাই হিমালয়ের সঙ্গে। পরামর্শ দিই, নাইবা হল এবছর হিমালয়যাত্রা। টিকিট যখন কেনা, এবার ভারতের এসব দেশ ভ্রমণ করে আসাই ত ভাল। সে-সবও তো না-দেখা নতুন জায়গা। আগামী বছর হিমালয়ে গেলেই হবে। হিমালয় তো পালাচ্ছেনা! কিন্তু, তবু তাঁর মত বদলায় না। অচল হিমাচলের মত অটল থাকে। কথা শুনে গম্ভীর হন। অনুযোগ করেন, আপনার মুখে একী কথা! বেশ বুঝতে পারি, হিমালয় তাঁকে সত্যই টানছেন। অন্যত্র যাত্রার উপদেশ বৃথা। ক্লেশের অনলে পুড়ে আনন্দের খাঁটি সোনার সন্ধান তিনি পেতে চান। তাই, বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে বলেন, দেখুন, যাওয়া না-যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে আসিনি। এসেছি পথ-ঘাটের খবর নিতে। কোন দিকে যাবো তারই পরামর্শ করতে। তারপর, শুরু করেন পরামর্শ। যাবেন, Valley of flowers বা নন্দনকাননে, লোকপালে, বদরীনাথে, বিয়েহী তাল বা

গোপালেকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেন। দু তিন দিন ধরে আসেন—সেই কাশীপুর থেকে। কাগজে বিবিধ প্রশ্ন রোজ লিখে আনেন, উত্তরগুলি পাশে টুকে নেন। ম্যাপ ছড়িয়ে যাত্রাপথের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় করতে বল্লেন।

আমারও যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। যাত্রার দিনেও সকালে এসে আবার দেখা করে যান।……

* * * * *

মাস তিনেক পরের কথা। শীতকাল। কয়েকদিনের জন্যে আবার কলকাতায় এসেছি। শ্রীমান জ্যোতিকুমার খবর রাখেন দেখি। খবর না দিলেও নিজেই এসে দেখা করেন। আগ্রহ সহকারে তাঁর যাত্রার বিস্তারিত বিবরণ শুনি। তাঁর তোলা ছবিগুলি দেখি। মানস-রথে বসে আমিও আবার হিমালয়ের সেই সব পথে ঘুরে আসি। শহরে বসেও হিমালয়-যাত্রার অমৃতস্বাদ উপভোগ করি দুজনে গল্প করে।

কথার ফাঁকে-উঁকি মারে জ্যোতিকুমারের যাত্রা বিবরণী লিখে রাখার পরিকল্পনা। বলেন, মাঝে ইচ্ছা হয় ঠিক যা দেখে এসেছি, যেমন ভেবেছি—সেগুলি লিখে ফেলি। কিন্তু লেখা তো আমার আসে না। কখনও চেষ্টাও করিনি। কল-কব্জা, কারখানা নিয়ে কারবার, কলম ধরব কি! চিঠি লিখতেই হাত কাঁপে! উৎসাহ দিই। বলি, লেখার সত্যই যদি প্রেরণা পাও, লিখবে নিশ্চয়। তাতেও আনন্দ আছে। বানিয়ে যদি না লেখো, লেখা আপনি আসবে।

কাজের লোকের সময়ের অভাব হয় না। শত কাজের মধ্যেও কাজ করতে জানেন। দু-তিন মাসেই তাঁর লেখা শেষ হয়।

এই সেই লেখা। সহজ সরল ভাষায় হিমালয় যাত্রাপথের কাহিনী। রোমান্টিক কোন উপন্যাস নয়, রোমাঞ্চকর উপাখ্যানও নয়। লেখকের দেখা হিমালয়-পথের অমিশ্র বর্ণনা; পথের সঙ্গী-সাথীদের পরিচয়, পথিক-জীবনের সুখ-দুঃখ, বহুবিধ অসুবিধা, অনাহারে অত্যাচারে শারীরিক গ্লানি, রোগ ভোগ—লেখকের দেহে মনে এই সব কিছুর প্রভাব লেখার মধ্যে ব্যক্ত হয়। পড়তে বসে মনে হয়, যেন লেখকের সাথী হয়ে পথ চলেছি। এ-সবই বাস্তব ঘটনা। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয়ের আপাত সুখ দুঃখের কথা। কিন্তু, এই সকলের অন্তরালে লেখকের মনের গোপনপুরে দেবতাত্মা হিমালয়ের সুমধুর

আনন্দ-সঙ্গীতের ঝঙ্কার ওঠে। যাত্রা-পথের নানান দুঃখ-কষ্টের সূত্র ধরে মন তাঁর সত্য-সুন্দরের সন্ধান করে। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ স্বীকৃত হয় তাঁর লেখার মধ্যে। ক্লান্ত দেহ পরাভব মানেনা শ্রান্তির মাঝেও মন শান্তি পায়, তাই আবার হিমালয়ে ফিরতে চায় বারে বারে। প্রকৃত হিমালয় প্রেমিকের এইখানেই পরিচয়। মর্মে মর্মে সে অনুভব করে, মানুষ-মনের ক্ষুদ্র বৃত্তিগুলি মহান গিরিদেবতার পাদ-স্পর্শে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়। অন্তরের মানস-সরোবরে ফুটে ওঠে রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম—মানব মনের যা কিছু চিরন্তন সদ্‌গুণ—তারি দিব্য গন্ধে শান্তি ও আনন্দে ভরে ওঠে পথিকের মন। আত্মহারা হয়ে হিমালয়ের অরণ্য-কান্তারে, শিখরে শিখরে ছোটে—কস্তুরী মৃগসম। হারিয়ে যাওয়া আপনাকে ফিরে পেতে চায় মানুষ সেইখানে। তাই বুঝি হিমালয় এমনি ভাবে বারে বারে টানে।

কিন্তু, দেহধারী মানুষকে কর্তব্যবুদ্ধি সজাগ করে তোলে। সংসারী মানুষকে তাই আবার ফিরতে হয় সংসারে। দো-টানায় মন তার দুদিকে দুলতে থাকে।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

"নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত পত্রনেত্র
যেন ত্বয়া ভারত তৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো
জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।"

প্রাচীন ভারতের মহাত্মা বেদব্যাস রচিত মহাভারতের আমল থেকেই দেখা যায় যুগে যুগে হিমালয় প্রতিটি ভারতবাসীকে আকর্ষণ করেছে। আবহমান কাল ধরে, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই মহাশৈল হিমবান হিমালয়কে অবলম্বন করে। আজও হিমালয় যাত্রার কথা ও কল্পনায় মন বৈরাগ্য চঞ্চল হয়ে ওঠে।

একদিকে অপূর্ব সুন্দর স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত নৈসর্গিক শোভা, অন্যদিকে অধ্যাত্ম-জীবনের সন্ধানে এদেশের ভক্তিপিপাসু এবং আনন্দভিক্ষু মানুষ বারম্বার ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়েছে হিমালয়ের গহন অরণ্য-লোকে, দুর্গম গিরি-গুহায় আর দুরারোহ পর্বতমালায়। ধনী নির্ধন, সবল দুর্বল, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ —সকলশ্রেণীর ভারতবাসীর অন্তরে চিরকাল ধ্বনিত হয়ে এসেছে দূর দুর্গম এই তীর্থপথের ডাক প্রাচীন ভারতের মহাত্মা বেদব্যাস, গৌতমবুদ্ধ, মহাকবি কালিদাস, আচার্য শঙ্কর, গুরু নানক, রামানুজ, তীর্থঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁদের মর্মলোকেও একদা এই ডাক এসে পৌঁছেছিল। কেউ খুঁজেছেন দেবত্ব-লাভের পথ, কেউ চেয়েছেন সাধুমহাত্মা মহাপুরুষের দিব্যদর্শন। কেউ বা সন্ধান করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও নির্জন নিভৃত পার্বত্য তপোবনে তপস্যার আশ্রম। এইভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষের সকল প্রকার ঐতিহ্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে যুগ-যুগান্তরের মহাপুরুষগণের পরমপুণ্য অবদানে। সমগ্র হিমালয়ের অসংখ্য নদীতীরে, বিজন ভীষণ অরণ্যপথে, গিরিসঙ্কটের স্তরে স্তরে—তাঁরা আপন আপন মহিমা ও কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন মন্দিরে আর প্রস্তরে; প্রতিমায় আর বিগ্রহে, তপোবনে আর গিরিগুহায়, নদীপথ আর সঙ্গমে। প্রায় দেড়হাজার বছর আগে তরুণ যুবক জগৎগুরু শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবান কেদারনাথ ও বদরীনাথের বিশ্ববিশ্রুত দেবস্থান। আচার্য শঙ্করের সেই উত্তর ধামের আকর্ষণে

যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ তীর্থ পথিক হিমালয় পর্বতের তুষারধবল দুরূহ কঠিন পার্বত্য পথে অভিযান করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন তপোলোক পেরিয়ে দেবলোকের পথে—দেবলোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোকে। মহাকবি বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে স্বর্গারোহণের বর্ণনায় এই তীর্থপথকেই "মহাপ্রস্থানের পথ" বলে অভিহিত করেছিলেন।

ভক্তিনম্র হৃদয়ে এই মহাতীর্থ পথের সঠিক বর্ণনার চেষ্টা করেছি। ভুল-ত্রুটী মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে। সেটুকু ক্ষমা করে আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা সবসাধারণ কাজে লাগাতে পারলে ধন্য হবো।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্যার আশুতোষের যোগ্য পুত্র, মহান পরিব্রাজক এবং আজীবন হিমালয়-পথ-যাত্রী শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমার যাত্রার গোড়া থেকেই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে, তথ্য ও মূল্যবান উপদেশ দিয়ে এক মহাঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং আমার এই লেখাটুকু পড়ে ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর এই স্নেহের দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। পরহিতব্রতী, সংসারবিরাগী এই ব্রহ্মচারী, হিমালয়-প্রেমিকের আশীর্বাদ অক্ষয় হয়ে থাকুক আমার হিমালয় যাত্রা পথে।

পরম-সুহৃদ, হিমালয়-প্রেমিক শঙ্কু মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিয়ে এই বইখানি প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

এই সঙ্গে সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মৈত্রের নামোল্লেখ না করলে মহা অন্যায় হবে। তাঁরই শিক্ষায় আমার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার সদাই উন্মুক্ত। কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি, তিনিই জানেন। গুরুপ্রণামী স্বরূপ এই বইখানি তাঁরই হাতে তুলে দিলাম

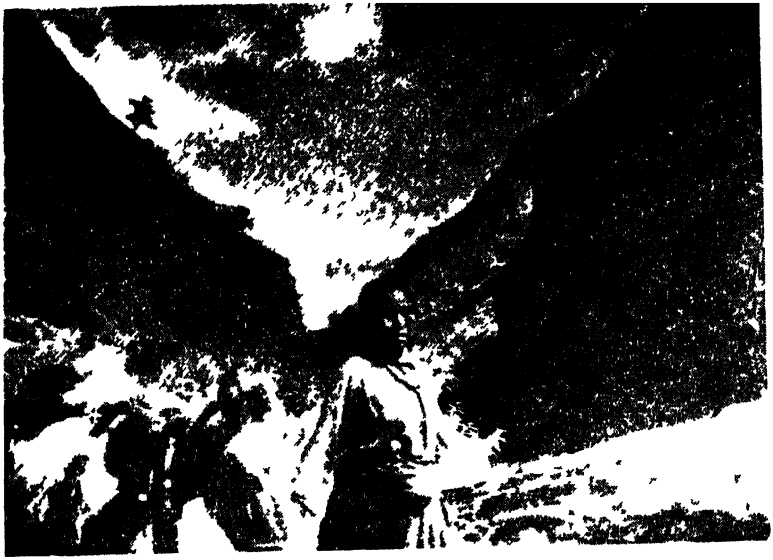
লেখক



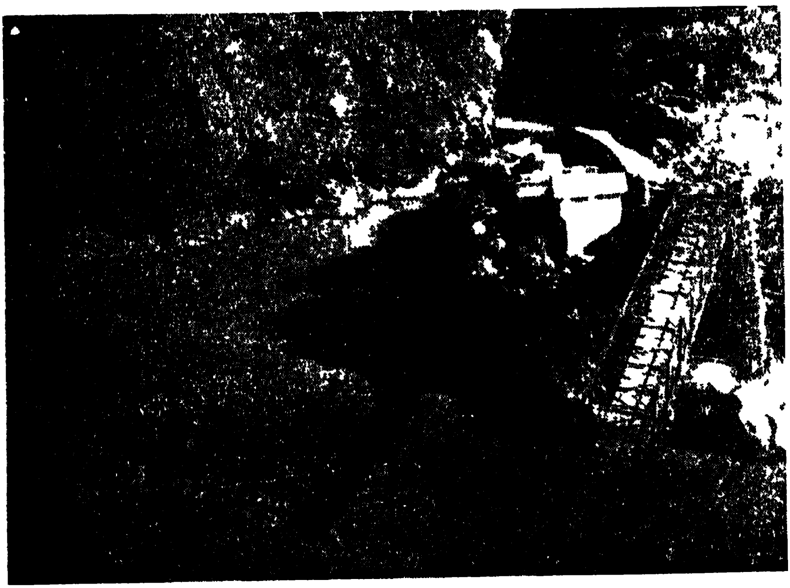
হর-কি-পউরী (হরিদ্বার)



জোশীমঠ



ডাংশানের গাড়োয়ালী মালবাহিকা



বিষ্ণু প্রয়াগ—অলকানন্দা ও ধৌলীগঙ্গার সঙ্গম
ধৌলীগঙ্গার সেতু পার হয়ে বদরীনাথের পথ



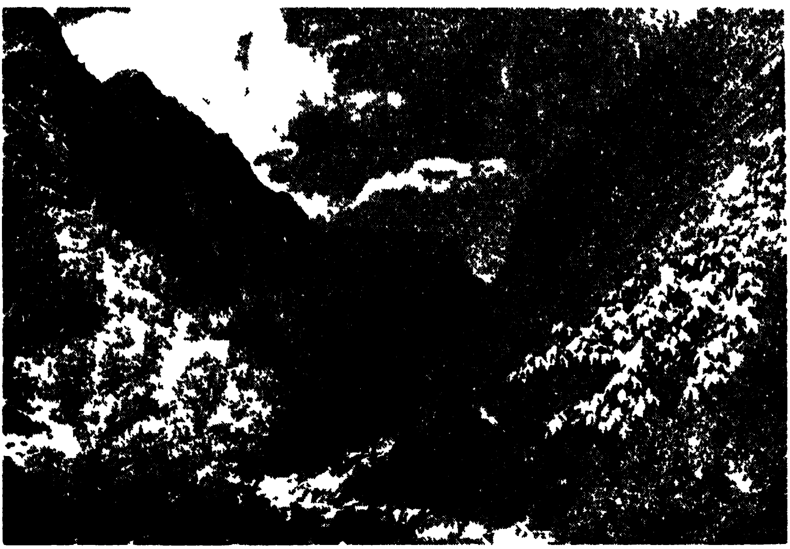
নন্দনকাননে লেখক – পিছনে 'রামনিশিখর' পর্বত



নীলগিরি অভিযাত্রীদের সঙ্গে নন্দনকাননে



ব্রহ্মকমল



অলকানন্দা উপত্যকা লামবগড়



গোবিন্দঘাট— অলকানন্দার সেতু পার হয়ে হেমকুণ্ড-নন্দনকানন যাবার পায়ে-চলা পথ



গোবিন্দঘাটে গাড়োয়ালী মেয়ে



[illegible] নন্দনকানন হেমকুণ্ডের প্রবেশদ্বার



হেমকুণ্ড







উপরে ঃ অলকানন্দার তীরে বদরিকাশ্রম — নীচে ঃ গোনাতাল—বিরহী

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সুবিধা পেলেই ছুটির দিনগুলো হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কাটিয়ে আসি। এবারে কিন্তু যাচ্ছিলাম রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানগুলি দেখতে। একটি পর্যটক সমিতির পরিচালনায়, আশ্বিনের গোড়ার দিকে। টাকা ইত্যাদিও জমা দেওয়া হয়েছিল দু'মাস আগেই। দেবাদিদেব বোধহয় হেসেছিলেন সেদিন।

হিমালয় সম্বন্ধে কোন লেখা অথবা ভ্রমণকাহিনী পেলে সাগ্রহে পড়ে থাকি। যাত্রার মাত্র কয়েকদিন আগে। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা সদ্য প্রকাশিত 'হিমালয়ের পথে পথে' বইখানা হাতে আসে। বইখানিতে বর্ণিত মধ্য হিমালয়ের তিনটি বিখ্যাত নদীর অববাহিকা আর মহাতীর্থপথের কাহিনী পড়ে বহুদিনের ইচ্ছা প্রবলবেগে আবার মনে জেগে ওঠে। হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ আমার পূর্ব পরিকল্পনা ভাসিয়ে দেয়।

অলকানন্দা, ভূইন্দার ও বিরহীগঙ্গার গতিপথ অনুসরণ করে সুদীর্ঘ পদযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। এবারে আমার যাত্রাপথ, দুরূহ কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ। স্বয়ং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 'মহাপ্রস্থানের পথ'। যে পথ যুগ যুগান্ত ধরে প্রতিটি ভারতবাসীকে আকর্ষণ করছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, আর বাঁচিয়ে রেখেছে তার স্নেহধারায়। মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেনের নামানুসারে পরিচিত ভুইন্দার বা ভুন্দর নদীর গভীরতর অঞ্চলে আছে ত্রেতা ও দ্বাপরের বিশিষ্ট তীর্থক্ষেত্র, দুটি পরমাশ্চর্য সুন্দর স্থান—হেমকুণ্ড-লোকপাল আর বিশ্বের বিস্ময় 'Valley of flowers' অথবা নন্দন-কানন। অলকানন্দার তীরে হিন্দুর মহাতীর্থ বদরিকাশ্রম, স্বর্গারোহিনী ও অলকাপুরী। নৈসর্গিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। আর পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত ত্রিশূল পর্বতের নিচে সতীহারা মহাদেবের অশ্রুজলে সৃষ্ট বিরহীগঙ্গা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সৃষ্ট বিরহীগঙ্গার উৎস-গোহনা হ্রদ। মহাকবি কালিদাসের রচিত অমর কাব্য 'কুমার-সম্ভব'য়ে বর্ণিত অপূর্ব সুন্দর পাহাড়-পর্বত ও সবুজ অরণ্যের মধ্যে এক আশ্চর্য জলাশয় —স্বর্গের সুষমা মণ্ডিত।

মন স্থির করবার সঙ্গে সঙ্গেই একের পর এক বাধা এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। চারিদিকে নানা অসুবিধা, আর অযথা হয়রানি—সবশেষে যাত্রার পূর্বে ইনফ্লুয়েঞ্জা। তাই নিয়েই একুশে সেপ্টেম্বর প্রবল বর্ষণের মধ্যে রওনা হলাম। এক হাঁটু জল ঠেলে গাড়ী ক্রমাগত থেমে যায় আর 'তারা-তারা' ব'লে আকুল আবেদন জানাই—এ যেন শিবানুচরদের দাঁত খিঁচুনী দিয়ে আমায় নিরস্ত ও ভীত করার চেষ্টা। শাস্ত্রেও আছে 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'।

অতি কষ্টে আধ ঘন্টার পথ আড়াই ঘণ্টায় অতিক্রম করে হাওড়া স্টেশনে পৌছলাম। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের বাইরে আমার নির্দিষ্ট কামরায় উঠতে গিয়ে বাকী জিনিসপত্র ও সামান্য বিছানাটাও ভিজে গেল। যাত্রীরা না আসাতে ডুন এক্সপ্রেস ট্রেন প্রায় দু ঘন্টা দেরীতে ছাড়ল। শত দুর্যোগ মাথায় করে রওনা হলাম—দুর্নিবার আশা বুকে নিয়ে।

মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রারম্ভে লোমশ মুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'লঘুর্ভব'। সেই উপদেশ মনে রেখে আমিও এবার যতটা পেরেছি জামাকাপড়, বিছানা ও জিনিসপত্র অত্যন্ত কম ও হালকা করেছি। বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনে উঠে দেখি সবই ভিজে গেছে, গায়েও বেশ জ্বর আছে। ট্রেনের কামরা প্রায় খালি। রিজার্ভ করা কামরার যাত্রীরা বৃষ্টির জন্যে আসতে পারেন নি অনেকেই। কম্বল, চাদর জামাকাপড় পাখার হাওয়ায় শুকাতে দিয়ে শুধু বেঞ্চে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। পথে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া। মন আশঙ্কায় দুলে ওঠে, হিমালয়ের পথে যদি এই বৃষ্টি থাকে, আরও কত অসুবিধা ও কষ্ট হবে। কিন্তু পথ যত দুর্গম হবে, পথ-কষ্ট যত বাড়বে, ততই তো পথ চলায় সার্থকতা - লক্ষ্যে পৌছন তৃপ্তিদায়ক।

২৩শে সেপ্টেম্বর সকাল ৭।৪৫ মিঃ হরদ্বারে ট্রেন থেকে নেমে ট্রেনের সহযাত্রী ঘোষ ও ব্যানার্জি দম্পতিদের বিশেষ আগ্রহে সাইকেল রিক্শা চড়ে সবজীমণ্ডীর ভেতরে লালটোপী ধর্মশালাতে এসে উঠলাম। বড় রাস্তা থেকে সামান্য পথ গলির ভেতরে। বাজারের মধ্যে এই ধর্মশালা- প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ী। ভেতরে প্রশস্ত আঙ্গিণা। ঘরগুলো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে, রামঘাটে গিয়ে গঙ্গার ব্রীজ (শতাব্দী সেতু) পার হয়ে ওপার থেকে কয়েকটি ছবি তুললাম। তারপরে সুন্দর সাজানো একটা পার্কের মধ্যে অল্পক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে এপারে ফিরে আসি। উদ্যানটিতে ফুলের বেড, বসবার বেঞ্চ ইত্যাদি আছে। সান্ধ্য ভ্রমণের বেশ মনোরম স্থান। এপারে এসে

হর-কি-প্যারী ও ব্রহ্মকুণ্ড দেখে ফিরতে হল প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে। বেলা দশটা বেজে গেছে।

হিন্দু ভারতের প্রাচীন ও বিশিষ্ট স্থান হিসাবে হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি আছে। এই বিশাল দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত পবিত্রতম নদী গঙ্গার সমতলে বিকাশ, পারিপার্শ্বিক মনোরম এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সমৃদ্ধ হরিদ্বার, যুগ যুগ ধরে অগণিত হিন্দুদের কাছে মহাতীর্থ হিসাবে গণ্য হয়েছে। যদিও সমৃদ্ধ জনপদ হিসাবে হরিদ্বারের প্রাচীনত্ব খুব বেশী দিনের নয়। সম্ভবতঃ একাদশ অথবা দ্বাদশ শতাব্দী। কিন্তু পুরাণে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের স্থান আজকের শহর থেকে অতি নিকটেই। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল গঙ্গাদ্বার এবং সেকালের প্রসিদ্ধ ঋষি কপিল মুনির আশ্রম এখনও 'কপিলা স্থান' নামে বর্তমান। তাঁছাড়া এই গঙ্গার ঘাটে প্রতি দ্বাদশ বর্ষে কুম্ভমেলায় লক্ষ লোক শুভ মুহূর্তে বিষ্ণুচরণ-বিধৌত গঙ্গার পবিত্র বারিতে স্নান করে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় করেন।

ধর্মশালায় ফিরে নিচের তলায় প্রশস্ত স্নান ঘরে আরামে কলের জলে স্নান করে নিলাম। জলযোগ সেরে গল্প-গুজব চলল। শ্রীমতী ঘোষ ও ব্যানার্জি স্টোভে রান্না চড়িয়েছেন। তীর্থ-যাত্রী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আহারাদি না করিয়ে ছাড়বেন না। বাজার থেকে তরিতরকারী এনেছেন ঘোষ মশাই, দই ও রাবড়ি এনেছেন ব্যানার্জিবাবু। এখানকার রাবড়ি নাকি বিখ্যাত, তবে একটু মিষ্টি কম। আহারাদির পর ধর্মশালার ঘরের সামনে বসে সকলের একটা ছবি তুলে, বেলা আড়াইটেয় টাঙ্গায় চড়ে বাসস্ট্যাণ্ড অভিমুখে রওনা হলাম। সস্নেহ আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন ঘোষ ও ব্যানার্জিবাবু। তাঁদের সাদর ও প্রীতিপূর্ণ আতিথ্য আমার যাত্রারম্ভে দেবতার আশীর্বাদের মতো সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে বিদায় নিলাম।

বড় রাস্তা ধরে রেলস্টেশন ছাড়িয়ে অল্প দূরে বাস ডিপো। এখান থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋষিকেশের বাস ছাড়ে। দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। বেলা তিনটায় বাস ছাড়ল। সুন্দর পিচ ঢালা পথ। দুধারে দীর্ঘ শস্যক্ষেত্র, ঔষধের কারখানা (Anti Biotic), শুকনো নদীগর্ভের ওপরে দীর্ঘ সেতু। সব ছাড়িয়ে প্রকাণ্ড ডিজেল বাস চলেছে আমাদের নিয়ে।

বেলা প্রায় ৪।১০ মিঃ ঋষিকেশে পৌঁছে, কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে কালিকমলি ধর্মশালায় গিয়ে ম্যানেজার শর্মাজীকে উমাপ্রসাদবাবুর চিঠি পেশ করি। দপ্তরে নাম ধাম লিখিয়ে দোতলায় একটা ঘর পেলাম। চৌকিদার ঘর

ঝাঁট দিয়ে মালপত্র রেখে দিল। তাকে বললাম একটা লোক ডাকতে, পাজামা গেঞ্জি ইত্যাদি কাচবার জন্য। চৌকিদার একটা নেপালী দোভিয়ালকে ডেকে দিল। জামাকাপড়গুলো কেচে দিয়ে সে লোকটা আমায় জিজ্ঞেস করল আমি কোথায় যাব? বললাম বদরিকাশ্রম ও নন্দন-কানন। সে বলল, আমার সঙ্গে যাবে। মাত্র ২।৩ দিন হল কলকাতার এক পরিবারের মালপত্র বাহক হয়ে সে হেমকুণ্ড, নন্দন-কানন ও গোহনা হয়ে ফিরেছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেয়ে বাস অফিসে চললাম। সেখানে পরিচয় হল জিম এণ্ড কোং'র ম্যানেজার শ্রীগুলাব সিংয়ের সঙ্গে। অনেকক্ষণ গল্প হল। গুলাব সিং আমায় জিজ্ঞেস করলেন শৌলমারীর সাধুর সম্বন্ধে। নেতাজীর প্রতি এদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখে গর্ব অনুভব করলাম। গুলাব সিংজীর কাছে শুনলাম. বৃষ্টির জন্যে পাহাড়ের পথ অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। বিকেলের ফিরতি বাস এখনও আসে নি এবং আজকে আর আসবেও না। অন্য কোম্পানীর বাসে চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গী নেপালীটাকে আমার মোটবাহক হিসাবে নেওয়া চলে কিনা জানতে চাইলাম। গুলাব সিং বললেন, এখান থেকেই লোক নেওয়া সুবিধা, এবং তাতে কোন বাড়তি খরচ হয় না। কারণ সঙ্গী কুলী তার বাসের ভাড়া নিজেই দেয়। তবে কুলী এজেন্সী থেকে চুক্তিপত্র ইত্যাদি করে নেওয়া ভাল।

সঙ্গী কুলী ঘুরবাহাদুরকে নিয়ে বাজারের মধ্যে নেপালীদের 'তীর্থযাত্রা মজদুর এজেন্সী'তে এলাম। লেখাপড়া করে চুক্তিপত্রে আমার সই ও ঘুরবাহাদুরের টিপসই নেওয়া হল। দুই ধাম অর্থাৎ বদরিকাশ্রম ও হেমকুণ্ডের জন্য ৮১৲ টাকায় রফা হল। তারপরে অন্য বাস কোম্পানীতে গিয়ে জানলাম যে আগামীকাল সকালের আগে কোন ব্যবস্থা হবে না।

সন্ধ্যার পর কালি কমলি ক্ষেত্রের ম্যানেজার শর্মাজীর বাড়ীতে গিয়ে সারা পথের ধর্মশালাগুলিতে আশ্রয়ের জন্য একটা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে নিলাম।

রাতে বাজারের মধ্যে একটা হালুয়াইয়ের দোকান থেকে পুরী, তরকারী মিষ্টি ও দুধ খেয়ে ধর্মশালায় শুতে এলাম। কয়েকদিন ট্রেনে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ সারাদিন নির্মল আকাশ ও প্রখর রোদ থাকায় বেশ গরম বোধ হয়েছে। ঘরে একটা বিজলী পাখাও আছে, সেটা চালিয়ে দিয়ে রাত দশটার পরে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম।

সবেমাত্র আসা পাতলা ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখি বিছানায় ও মেঝেতে অসংখ্য ছারপোকা ও ছোট ছোট লাল পিঁপড়েরা দল বেঁধে

আমাকে আক্রমণ করেছে। সারারাত প্রায় অনিদ্রায় কাটে ছারপোকার অত্যাচারে। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত ঘর বারান্দা, সেখানে ছারপোকার অত্যাচার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। পরে জেনেছি বদরিনাথের পথে জোশীমঠ পর্যন্ত সমস্ত ধর্মশালাতেই ছারপোকার প্রাচুর্য অব্যাহত। জোশীমঠের উপরে আর ছারপোকা থাকে না। হিমালয়ের তীর্থপথে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকারের শারীরিক কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা আছে, আহার সব সময় মিলবে না, এবং যাও বা মিলবে হয়ত যথেষ্ট পুষ্টিকর হবে না। তাছাড়া আছে পাহাড়ে চড়বার গুরুতর শ্রম। এ সবের ওপরে প্রতি রাত্রে ধর্মশালায় রক্তমোক্ষণে শরীর কদিন চলবে?

ঋষিকেশ অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিমালয় পথ-যাত্রীদের কাছে একটি স্মরণীয় স্থান। পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে গঙ্গার তীরে মনোরম দৃশ্যাবলীর মাঝে অবস্থিত। বর্তমানে একটা সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছে। বাস ও রেল পথের টারমিনাস। এখান থেকেই কেদার-বদরী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর যাত্রারম্ভ। অলকানন্দা নদীর অববাহিকা ধরে আমার বর্তমান পরিক্রমা।

॥ ২ ॥

যাত্রা

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতেই ঘুরবাহাদুর এসে হাজির হল। সকাল ৮টায় ধর্মশালা ত্যাগ করে বাজারের একটা দোকান সবেমাত্র খোলা পেয়ে কিছু জলযোগ সেরে বাসের সন্ধানে এগিয়ে চললাম। বাজারের প্রান্তে বড় রাস্তার ওপরে তীর্থ যাত্রার বাস ডিপো। অনেকগুলো বাস এত সকালেই লোক বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে বদরিনাথ, কোনটা টিহ্‌রী হয়ে ধরাসু যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। শেষোক্ত বাসে যাত্রীরা চলেছেন যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথে। অনেক কষ্টে একটা বাসে জায়গা হল, রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত। মাশুল—উচ্চশ্রেণী ৮·১৫ পঃ। ঘুরবাহাদুর নিজের জন্য নিম্নশ্রেণীর একটা টিকেট কেটে সেই বাসেরই পেছনের দিকে আমার মালপত্র সমেত বসল। আমি উঠলাম ড্রাইভারের পেছনের খাঁচায়। বাস ছাড়ল সকাল ৭।২০ মিঃ যাত্রীরা সমস্বরে ধ্বনি দিয়ে উঠল 'বদরীবিশালজিকী জয়'। বাসের যাত্রীদের দিকে ফিরে চাইলাম। যেন

ভারতবর্ষের একটি অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ। রাজস্থানী, বিহারী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী সবই আছে। অধিকাংশই দেহাতী মেয়ে পুরুষের দল। আমার খাঁচায়, অর্থাৎ আপার ক্লাসে, দুজন পুলিস কর্মচারী চলেছেন পুরোবর্তী হিসাবে। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল তীর্থযাত্রায় আসছেন।

এই যাত্রায় আমার গন্তব্য স্থানগুলি, প্রধানতঃ অলকানন্দার তীর ধরে প্রথমে হেমকুণ্ড ও নন্দনকানন। তারপরে বদরিকাশ্রম এবং সর্বশেষে বিরহী গঙ্গার ধার দিয়ে গোহনা হ্রদ। নন্দনকানন থেকে ভুন্দর নদী অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে বদরিনাথের পথে গোবিন্দঘাটে। আর বিরহী নদী অলকানন্দায় মিশেছে চামোলী ও পিপলকুটীর মাঝামাঝি বিরেহীতে। এটাও বদরীনাথ যাত্রার প্রধান পথ এবং এপথে মোটর বাস চলাচল করে। ১৩৪ মাইল পথ গিয়ে পিপলকুঠীতে বাস যাত্রার বিরতি। তারপর শুরু হবে আমার পদযাত্রা।

প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করে বাস এসে দাঁড়াল সরকারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, ইনোকিউলেশন চেক পোস্টে। রাস্তার অপর পারে প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ গঙ্গার গর্ভ। ওপারে স্বর্গাশ্রম ও গীতাভবন দূর থেকে অতি সুন্দর লাগছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীঘ্রই বৃষ্টি নামবে। স্বর্গাশ্রমের একটা ছবি নেবার চেষ্টা করছি। এদিকে বাসের ভেতরে বেশ শোরগোল পড়ে গেছে। দেহাতী তীর্থযাত্রীরা কলেরার টীকা নিতে অস্বীকার করছে। সরকারী কর্মচারীরা তর্জন করছে আর যাত্রীদের অস্থায়ী গার্জেন পাণ্ডারা বোঝাচ্ছে। তারপরে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে পুণ্যার্থী মেয়ে পুরুষরা টিকা নিতে বাধ্য হচ্ছে। একটি প্রৌঢ়া স্থূলকায়া জ্বরের ভান করেও পরিত্রাণ পেল না। অবশেষে চল্লিশ মিনিট কাল শাস্তির পরে বাস আবার ছাড়লো। আমার টিকা নেওয়া কলকাতাতেই হয়েছিল এবং সঙ্গে কাগজপত্রও ছিল। কিন্তু কেন জানি না আমাকে কেউ জিজ্ঞাসাও করলে না। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার, সারা পথে কত কষ্ট স্বীকার, তদ্বির ও অযথা হয়রানি করে সংগ্রহ করেছি বিশেষ অনুমতি পত্র, নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার জন্য। সেই পারমিটও কোথাও দেখাবার প্রয়োজন হয় নি। কেউ জানতেও চায় নি আমার অনুমতিপত্র আছে কিনা। অথচ চীন-ভারত যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি। শুধু তাই নয়, সারা পথে বনবিভাগ, পুলিস ও সৈন্য বিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের কাছে বিশেষ সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে এসেছি, কোনরূপ পরিচয় না দিয়েই। আমার মন বলছে হিমালয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণই

আমাকে সর্বত্র মিলিয়েছে অবারিত আতিথ্য। হয়ত বা আমার মনের অনুভূতি সর্বক্ষণ ফুটে থাকতো আমার মুখের ভাবে ও চোখের দৃষ্টিতে। তাই হয়ত লোকে আমায় চিনতে ভুল করেনি, করেনি কোন জিজ্ঞাসা। সংশয়শূন্য চিত্তে আমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে।

স্বর্গাশ্রমের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ত্যাগ করে বাস ক্রমশঃ পাহাড়ে চড়ছে। ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে পাহাড়ী ঝরনা অতিক্রম করে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখে। অনেক নিচ দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলে। হিমালয়ের পাহাড়ী পথে নদীপথই একমাত্র সহযাত্রী, পথের নিশানা। এই নদীপথ অবলম্বন করেই পথ তৈরী হয়েছে হিমালয়ের সর্বত্র। গাড়োয়ালের এই পার্বত্যপথও তেমনি গঙ্গা ও অলকানন্দার গতিপথ ধরে এগিয়ে চলেছে ঘুরে ঘুরে, চড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে, ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে, চিরতুষারের রাজ্যের আরও কাছে। বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি—চারিদিকে সবুজ বনানী শোভিত উন্নত পাহাড়ের শ্রেণী। কোথাও পাহাড়ের থাকে থাকে গাড়োয়ালী শস্যক্ষেত্র, অতিক্ষুদ্র খেলনার মত বাড়ী। দূরে দূরে দু-একটা পাহাড়ী গ্রাম, আর তার মাঝখান দিয়ে অনেক নিচে মহাবেগে বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। দেবলোক থেকে মর্তলোকে—সমতলের মাটিতে, তাঁর স্নেহধারায় পুষ্ট করতে ভারতের কোটী কোটী সন্তানদের যুগ-যুগান্ত ধরে।

একদা দক্ষরাজার রাজধানী কনখলের কাছে গঙ্গাবতরণের দৃশ্য বর্ণনায় অমর কবি কালিদাস বলেছেন—

'তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং জহ্নোঃকন্যাং
সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙক্তিম্।
গৌরী বক্ত্র-ভ্রূকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ শম্ভোঃ কেশগ্রহণম
করোদিন্দু-লগ্নোর্মি-হস্তা ॥'

(মেঘদূত)

[পর্বতের বহু উচ্চস্থান হইতে ধাপে ধাপে গঙ্গা হিমালয়ের গাত্র বাহিয়া নামিয়া আসিয়া সমতলে পড়িতেছেন। সে গঙ্গাপ্রপাত দেখিতে বড়ই সুন্দর। উচ্চস্থান হইতে প্রপাতগুলি পড়িতেছে আর পুঞ্জীকৃত ফেনরাশি প্রতি প্রপাতের মুখে আশে পাশে জমিতেছে। উপর হইতে নিচের দিকে চাহিলে তোমার মনে হইবে যেন সগরপুত্রগণ এই ভাগীরথীর পবিত্র জলময় সিঁড়ি বাহিয়া স্বর্গে উঠিয়াছিলেন।' পর্বত গাত্রে পাথরের খাদে খাদে গঙ্গার

প্রপাত-মুখগুলিতে ঐ পুঞ্জীভূত অনন্ত ফেনরাশী দর্শনে ঠিক বোধ হইবে, যেন ঐ খাদগুলির দুই ধার—যে পথ দিয়া জলধারা উপর হইতে নামিতেছে—তাহা মা গঙ্গার মুখের অধর এবং ওষ্ঠ, আর সেই মুখের হাসি হইল ঐ ফেনরাশি, যেন তরঙ্গরূপ হাত উপরের দিকে বাড়াইয়া মহাদেবকে জটাকর্ষণে টানিতেছেন—সতীন গৌরী দেবীর (গৌরী পর্বতের শিখর দেশ) ভ্রুকুটি, হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়া। দেবীর তরঙ্গরূপ কর চন্দ্রশেখরের কপালের চাঁদ ধরিয়া নাড়া দিতেছে, আর চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নার ধারা গঙ্গার ঐ তরঙ্গলহরে মিশিতেছে।]৭)

ছোট বড় প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই মেশানো কঠিন বন্ধুর পথে পাহাড়ের গা বেয়ে বাসের রাস্তা, মাঝে মাঝে ঝরনার জল রাস্তার ওপর দিয়ে বহু নিচে নদীতে গিয়ে মিশছে। অতিরিক্ত বর্ষার দরুণ কোথাও ধস নেমেছে ও রাস্তা ভেঙ্গেছে। অতি সন্তর্পণে আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে টাটা ডিজেলের বাস, বেশ মজবুত নির্ভরযোগ্য!

একটানা ১৮৷২০ মাইল পথ অতিক্রম করে বাস এসে দাঁড়াল বেলা নটায় একটা ছোট্ট জায়গায়, নাম বিয়াসী। দু-তিনটি অতি ক্ষুদ্র চায়ের দোকান। এক গ্লাস চা খেলাম। কয়েক মিনিট পরেই বাস আবার ছাড়ল। ক্রমশঃ হিমালয়ের গভীরে একটানা আরও ২৪ মাইল এসে দাঁড়াল দেবপ্রয়াগে—ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমে। অতি সুন্দর মনোরম শোভামণ্ডিত বর্ধিষ্ণু, জনবহুল ও কর্মব্যস্ত এই দেবপ্রয়াগ। এখানে সদাব্রত, ধর্মশালা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ডাকবাংলো, বাজার, ডাকঘর ইত্যাদি আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ স্থানের উচ্চতা ১৬৩০ ফুট।

আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সঙ্গমের ছবি নেওয়া সম্ভব হল না। ঋষিকেশ অভিমুখে ডাক নিয়ে বাস ছাড়বে, তাই তাড়াতাড়ি একটা পোষ্টকার্ড লিখে মেলবাসের চালকের সহকারীর হাতে দিলাম। বাড়ীতে বলেছিলাম সর্বদা খবর দেব। আমার সংবাদ নিয়ে কলকাতার পথে ডাকগাড়ী চলে গেল সমতল অভিমুখে।

দেবপ্রয়াগে শুধু একগ্লাস চা পান করেছি। বৃষ্টির জন্য বেশ শীত লাগছে। গায়ে আছে কটসউলের হাওয়াই শার্ট ও সুতী কর্ডের প্যান্ট। আধঘন্টা অপেক্ষা করে বাস ছাড়ল বেলা প্রায় বারটায়। এবারে আরও ২০ মাইল পথ এক ঘন্টায় পেরিয়ে কীর্তিনগর। গঙ্গার তীরে সমৃদ্ধ জনপদ।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট। এখানে গঙ্গার উপরে বিশাল সেতু—লোহার ঝোলাপুল পার হয়ে 'শ্রীনগর' পৌঁছলাম বেলা দেড়টায়। শ্রীনগর প্রাচীন এবং বড শহর। ডাকবাংলো, পোষ্টাফিস, টুরিষ্ট অফিস আছে। শ্রীনগরে এককালে টিহ্‌রীরাজের রাজধানী ছিল। এখান থেকে পউরী যাবার বাস পাওয়া যায়। পউরী থেকে কোটদ্বার হযে রেল অথবা মোটর বাসে দিল্লী পর্যন্ত যাবাব সুব্যবস্থা হয়েছে।

ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভের পর কিছু সংখ্যক রাজপুত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হিমালয়ের এইসব অঞ্চলে এসে রাজ্য স্থাপন করে বাস করতে থাকেন। ছোট ছোট রাজারা (সর্দার) নিজেদের সীমানা গড বা কেল্লার দ্বারা সুরক্ষিত করেছিলেন। বহু গড়ের সমষ্টি এই 'গড়বাল' বা গাডোয়াল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে দুর্ধর্ষ গুর্খাদের দ্বারা আক্রান্ত ও বিজিত হয়। তদানীন্তন বৃটিশরাজের সহায়তায় গাডোয়ালীরা গুর্খাদের হারিয়ে হৃত রাজ্য ফিরে পায় ১৮১৫ সালের যুদ্ধে। কিন্তু সাহায্যের মূল্যস্বরূপ অর্ধেক গাড়োয়াল সেই সময় থেকেই বৃটিশ অধিকারে চলে যায়। বাকী অংশ টিহ্‌রী গাডোয়াল নামে দেশীয় সামন্ত রাজ্য হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখে বর্তমান স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত।

শ্রীনগরে পথের ধারে সারি সারি হোটেল। টিনের বড বড ঘরে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা। একটা হোটেলে ঢুকে জানলাম মাংসের ঝোল ও ভাত পাওয়া যাবে। গোটা গাডোয়ালে মাত্র তিনচারটে জায়গায় মাংস খেতে পেয়েছি। দোকানে বলতে হবে 'মীট্', মাংস বললে বুঝবে না, আর গোস্ত বা গোস্ বললে রেগে যাবে, অহিন্দু মনে করে। আমি ভুল করে 'গোস্ মিলে গা' বলায় আমাকে প্রায় তাডিয়েই দিয়েছিল। শেষে জামার ভেতর থেকে পৈতাগাছটা বের করে দেখাতে অনুমতি মিললো। পৈতার কি অপার মহিমা! পথে বাইশে তারিখে লক্ষ্ণৌতে মাংস জুটেছিল, তারপর থেকে নিরামিষ। আজ ভাগ্যক্রমে কিছু প্রোটিন জুটলো।

গরম গরম বাসমতী চালের ভাত, ডাল, তরকারী ও মীট। বেজায় শক্ত, দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়া যায় না। কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে পরম পরিতোষ করে আহার সমাপ্ত করে পান চিবুতে চিবুতে বাসে বসে অপেক্ষায় আছি, কখন 'গেট্' ছাড়বে। এই গাড়োয়ালের পার্বত্য পথে **One way traffic** অর্থাৎ রাস্তা এত সংকীর্ণ যে মাত্র একটি গাড়ী চলতে

পারে। বড় বড় কয়েকটি স্থানে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের মতো রাস্তা বন্ধ। লোহার বেড়ার পাশে পুলিস প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে। টেলিফোন মারফৎ রাস্তা পরিষ্কারের খবর পেলেই, অর্থাৎ একদিকের বাস অন্য প্রান্তে পৌঁছালেই 'গেট' উঠিয়ে দেয়। তখন সারি সারি বাস, লরী, জীপগাড়ী ইত্যাদি রওনা হয়। এই কন্‌ভয়ের প্রথম গাড়ীতে চালকের পাশে গাড়ীর জানালার সঙ্গে একটা লাল নিশান লাগানো হয়। এবং সবশেষ গাড়ীতে থাকে সবুজ নিশান। একেই বলে 'গেট সিস্টেম'। এই রকম একটি গাড়ীর বাহিনী পথের বড় জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত দুই প্রান্তের গেট বন্ধ থাকে। উপরের অথবা নিচের পথের নির্দিষ্ট কয়েকটি সময় আছে যে সময় গেট খোলা হয়। পুলিসের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গেই বাস ছাড়তে হয়। কোনও গাড়ীকে কখনও বিশেষ প্রয়োজনে অপেক্ষা করতে হলে এই পুলিসকেই ধরতে হয়। এ বিষয়ে দেখলাম সারাপথে এদের বেশ শৃঙ্খলাবোধ আছে। বেলা ২।২০ মিনিটে বাসের কনভয় ছাড়ল। এরপরে 'কল্যাসহর'। এখান থেকে রুদ্রপ্রয়াগ প্রায় বার মাইল। বৃষ্টির মধ্যে খারাপ ও পিচ্ছল মাটি আর পাথরের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে বাসগুলো অতি ধীরে সন্তর্পণে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠছে। সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ীর চাকার খুবই কাছে রাস্তার ধার, তার পরেই একেবারে খাড়া পাহাড়ের বহু নিচে অলকানন্দা, পড়লে আর রক্ষা নাই।

প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেলা পাঁচটায় রুদ্রপ্রয়াগে এসে সেদিনকার মতো যাত্রার বিরতি। এ পথে সূর্যাস্তের পরে আর চলা সম্ভব নয়। মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থানে এই রুদ্রপ্রয়াগ। গয়রাজার যজ্ঞে অসন্তুষ্ট পরশুরামের শাপে ব্রহ্মরাক্ষসযোনীপ্রাপ্ত দুইলক্ষ ব্রাহ্মণ এখানে মুক্তিলাভ করেন। রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দির, ধর্মশালা, ডাক ও তারঘর, বাজার ইত্যাদি আছে। বেশ বড় জায়গা। এখান থেকে অলকানন্দার ধার দিয়ে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে বদরিকাশ্রমের রাস্তা একদিকে এবং অন্য পথে মন্দাকিনীর তীর দিয়ে কেদারের পথ। ওপারে বাস পাওয়া যায়। এইস্থান থেকে কেদার-বদরীর তীর্থ পথের জন্যে মোটবাহক ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বৃষ্টি পড়ছে। বদরিনাথ মন্দির কমিটির ধর্মশালায় স্থান থাকা সত্ত্বেও ছারপোকার ভয়ে 'ট্যুরিষ্ট হোটেল' নামে একটা ছোট্ট হোটেল অর্থাৎ খাবার দোকান খুঁজে বের করলাম। জানলাম রাতের মতো ঘর পাওয়া যাবে। বড় রাস্তার ওপরেই দোকান। ভেতরে ঢুকে ঘরের পিছন দিকে উঁচু খাড়া

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দোকানের চাকরের সঙ্গে চললাম ঘর দেখতে। দোকানটা আসলে দোতলা। উপরের অংশ রাস্তার পাশে দোতলায়। পেছন দিকটা অনেক নিচু। নিচের তলায় রান্নাঘর। তার সামনে প্রশস্ত খানিকটা সমতল জায়গা, তারপরে ঢালু হয়ে নদীগর্ভে মিশেছে। নদীর দিকে আঙ্গিণার অপর প্রান্তে একটি ঘর, মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনী। তীর্থযাত্রীদের রাত্রি বাসের জন্য মোটা পয়সা রোজগারের বেশ সহজ ও সস্তা ব্যবস্থা। আর অপর দিকে সারি সারি পায়খানা—কমিউনিটি লাট্রিন। দোকানী গর্ব করে বলেছে ঘরটা একটু খারাপ হলেও ধর্মশালার মতো ছারপোকা নেই। পাশাপাশি দুখানা ঘর, তার একটি মাত্র খালি পাওয়া গেল। ছোট্ট একটুখানি ঘর, নদীর দিকে একটা জানালা ও অপর দিকে একটি দরজা। একটা দড়ির খাটিয়া ও একটা ভাঙ্গা চেয়ার। ভাড়া রাত্রিবাসের জন্য দু টাকা চায়, দরাদরি করে দেড টাকায় রফা হল। মালপত্র রেখে উঠানের মধ্যে পিপায় রাখা জলে মুখ হাত ধুয়ে উপরের দোকানে গেলাম রাতের খাবার জন্য। প্রায়ান্ধকার দোকানের নডবডে টেবিলের সামনে এসে বসলাম। অনেক হাঁকাহাঁকি করে খাবার মিলল, রুটি ডাল ও একটু তরকারী। একই টেবিলে দুটি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও খাচ্ছেন। তাঁরা পরিষ্কার বাংলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন শুনে আলাপ করলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের দু'টি সন্ন্যাসী। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী যুবক সাধুটির নাম ব্রহ্মচারী শক্তি চৈতন্য—ডাকনাম সুধাংশু মহারাজ। ওঁরা কেদার-বদরী পরিক্রমা শেষ করে ফিরছেন। বললেন বদরিনাথের পথ নাকি বৃষ্টির ফলে প্রায় অগম্য শুধু মন্দির ছাডা পথের আর কোনও খবরই এঁদের কাছ থেকে পেলাম না। আমার মুখে নন্দনকানন, হেমকুণ্ড ও গোহনার কাহিনী শুনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হলেন। অনেক করে বললেন আমার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে। উমাপ্রসাদবাবুর লেখা 'হিমালয়ের পথে পথে' বইখানা পডতে পরামর্শ দিয়ে চললাম আমার রাতের ডেরায়। ঘর দুটো আগেই ভর্তি হয়েছিল, এখন দেখি ঘরের বারান্দায় সারি সারি খাটিয়া পাতা। সেখানেও যাত্রী সমাগম হয়েছে।

ঘরের একটু নিচ দিয়ে অলকানন্দা বয়ে চলেছে প্রবল গর্জনে। জানালা বন্ধ করে ছোট্ট একটা কেরোসিনের ডিবার আলোয় ডায়েরী লিখে শুয়ে পড়লাম রাত আটটায়। গত কাল ঋষিকেশের ধর্মশালায় ছারপোকার কামড়ে ঘুমাতে পারি নি তার ওপরে আজ সারাদিন বাসের ঝাঁকুনীতে সারাশরীরে

বেশ ব্যথা হয়েছে। বৃষ্টির ফলে নদীর জল বেড়েছে, অবিশ্রান্ত জলের শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, অকাতরে ……।

॥ ৩ ॥

রুদ্রপ্রয়াগ

গত রাত্রির সুনিদ্রার পরে ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গল। আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় সুমধুর সুরে মীরার ভজন গাইছেন একজন রাজস্থানী যাত্রী। কালকের বৃষ্টির ফলে বেশ শীত লাগছে ভোর বেলায়। হোটেলের চাকর একগ্লাস চা দিয়ে গেল।

মুখ হাত ধুয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা সেরে দোকানের প্রাপ্য মিটিয়ে সামনের বড়রাস্তার মাঝখানে প্রকাণ্ড পিপলগাছের তলায় বাস অফিসের রোয়াকে মালপত্র রাখলাম। সারি সারি মোটর বাস দাঁড়িয়ে আছে, দুই দিকে যাত্রার অপেক্ষায়। গতকাল রাতের পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদ্বয়ের সঙ্গে দেখা হল। ওঁরাও অপেক্ষা করছেন নিচের বাসের জন্য। বাসের অফিস খুলতে একখানা টিকেট কাটলাম চামোলী পর্যন্ত। চামোলীর গেট খুলবে বেলা আটটায়। এখনও দেরী আছে ঘণ্টা খানেক। বাস অফিসের নির্দেশ মতো, আমার বাসের নম্বর দেখে তাতে মালপত্র তুলে সীটের ওপরে জলের বোতল, হাতব্যাগ ইত্যাদি রেখে সামনের দোকান থেকে টাট্‌কা ভাজা গরম জিলাপী ও একগ্লাস দুধ খেয়ে নিলাম। বাসের রাস্তার পাশেই অল্প উপরে পোস্টাফিস, উপর থেকে নদীর একটা ছবি নিয়ে নেমে এসে বাসে উঠলাম। লাল নিশান শোভিত গেটের প্রথম বাস। ছাড়বার সময় যখন আসন্ন, হঠাৎ শুনলাম আমাদের গেটের একেবারে শেষ প্রান্তে নীলগিরি অভিযাত্রীদের বাস এসে পৌঁছেছে। কলকাতার হিমালয়ান এসোসিয়েশনের বারজন বাঙ্গালী ছেলে চলেছেন দুর্গম পর্বত শৃঙ্গাভিমুখে। ওদের দলের দু-এক জনের সঙ্গে কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। তখুনি গিয়ে দেখা করে এলাম।

আমাদের বাস ছাড়ল বেলা ৮৷১০ মিনিটে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া অল্প মেঘ, রোদ নেই। এক ঘণ্টায় নয় মাইল পথ অতিক্রম করে পাহাড়ী বড় ঝরনার ধারে ছোট্ট জায়গা 'ঘোলতীরে' এসে বাস দাঁড়াল। সামান্য সময় পরে আবার চলা শুরু। আরও পাঁচ মাইল কাঁচা মাটির অসমান পিচ্ছিল

পথ। বৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গেছে। রাস্তার ওপর থেকে মাটি আর পাথরের ধস পরিষ্কার চলেছে। তারই মধ্য দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে সন্তর্পণে লাফাতে লাফাতে বাস 'গৌচরে' পৌঁছল বেলা দশটায়। এখানে কিছুদিন বিমান অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল। প্রকাণ্ড মাঠ, তার পাশে উন্নত পাহাড়ের শ্রেণী। বেশ জনবহুল কর্মব্যস্ত স্থান। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চা খেয়ে নিলাম। সওয়া দশটায় বাস ছাড়ল। গৌচব থেকে ছয় মাইল গিয়ে ১০।৫৫ মিঃএ কর্ণপ্রয়াগ—পিণ্ডার ও অলকানন্দার সঙ্গম। দূর থেকে দেখলাম সঙ্গমের তীবে একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথায় মন্দির। ওইখানেই ত্রেতায় শ্রীবামচন্দ্র ও দ্বাপরে মহাবীর কর্ণ তপস্যা করেছিলেন। হতভাগ্য কর্ণের কথা মনে হতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। জীবনে কোনও সুযোগ সুবিধা না পাওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিজেব কৃতিত্বে শত বাধা ঠেলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ কবা, মহাবীব, মহাজ্ঞানী, দাতা কর্ণের ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা মনে পড়ে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল পূর্বাহ্নে সব জেনেও দুঃসময়ের বন্ধু দুর্যোধনকে ত্যাগ না করাব মহত্ত্ব—মহর্ষি ব্যাসদেব লিখিত মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণেব কাছে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কর্ণ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন—

'স এব রাজা ধর্ম্মাত্মা শাশ্বতোঽস্তু যুধিষ্ঠিবঃ
নেতা যস্য হৃষিকেশো যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥'

[এ যুদ্ধেব শেষে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজা হবে, কেননা নেতা যাঁব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর সেনাপতি যাঁর অর্জুন।]

ঐ ছোট্ট পাহাডেব চূড়ায় ঊর্ধ্ববাহু একপায়ে দাঁডিয়ে ঊষাকাশ থেকে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সূর্যের তপস্যারত কর্ণের মূর্তি মনে করবার চেষ্টা করি।

অল্প অল্প বৃষ্টিব মধ্যেই দুটো ছবি তুললাম। আধঘণ্টা পরে বাস ছাড়ল। বৃষ্টির মধ্যে সাডে নয় মাইল পথ অতিক্রম কবে বাস এসে দাঁড়াল 'লঙ্গাসু'তে। এখানে শুনলাম কিছু আগে ধস নেমে পথ ভেঙ্গেছে, ট্রানশিপ্‌মেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ বাস চলবে না, পায়ে হেঁটে ধস পার হতে হবে। লঙ্গাসুতে না দাঁড়িয়ে বাস চলল। কিছুদূরে গিয়ে নন্দপ্রয়াগ থেকে প্রায় সাডে তিন মাইল আগে 'সোন্‌লা'র কাছে বাস ছাড়তে হল। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে উপরের পাহাড থেকে মাটি ও পাথর ধ্বসে রাস্তা ভেঙেছে এবং বিরাট মাটি পাথরের স্তূপে বাস চলা বন্ধ হয়েছে। প্রায় একশত গজ এই ধসের

ওপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ওপারে দাঁড়ানো বাসে গিয়ে উঠলাম। ঘুর বাহাদুর সঙ্গে ছিল, আমার মালপত্র সে-ই বয়ে নিয়ে এসে বাসে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রী পূর্ণ হলে বাস রওনা হল। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে সাময়িকভাবে, আকাশে ঘন মেঘ। বেলা একটার পরে 'নন্দ-প্রয়াগ'—নন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম। রাজা নন্দ ও রমাপতির মন্দির আছে। পোস্টাফিস, বড়বাজার, ডাকবাংলো ইত্যাদি আছে। এখান থেকে কুমায়ুনের গরুড় যাবার নূতন রাস্তা হয়েছে। গোয়ালদাম এখান থেকে প্রায় ৩৬॥০ মাইল। সেখান থেকে বাসে গরুড় হয়ে আলমোড়া, রানীক্ষেত দিয়ে কাঠগোদাম রেল স্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার সুবিধা আছে।

বক্স নন্দপ্রয়াগে না থেমে নন্দাকিনীর ওপর দিয়ে সেতু পার হ'য়ে সাত মাইল পথ চলে বেলা দুটোয় চামোলীতে পৌঁছল। অলকানন্দার তীরে কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের পথের মিলন স্থান। জেলা সদর—পুলিস, পূর্ত ও বনবিভাগের কেন্দ্রস্থল। কুলা এজেন্সী, আদালত, হাসপাতাল, ধর্মশালা, ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ। এইখানে নামতে হল। 'ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে হবে. অনুমতিপত্র নেবার জন্য। বর্তমান চীন-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে (Notified area) যাবার জন্যে বিশেষ অনুমতি এখানে অথবা জোশীমঠে পাওয়া যায়। অবশ্য যাঁরা শুধু বদরিকাশ্রমে যেতে চান, তাঁদের অনুমতিপত্র লাগে না। উত্তর প্রদেশ সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে নিষিদ্ধ এলাকা (Notified area) গুলির বিশদ বিবরণ আছে। আমরা গন্তব্য স্থানগুলির মধ্যে হেমকুণ্ড নন্দনকানন ও কুয়ারী গিরিবর্ত্ম ঐ এলাকায় পড়ে। বদরিনাথ ছাড়িয়ে 'মানা'র দিকে যেতে হলেও বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী এইখান পর্যন্ত টিকেট কেটেছিলাম। বৃষ্টির মধ্যে বাস থেকে নেমে ছোট্ট খুপরীর মতো বাস অফিসের সামনের টিনের চালের নিচে মালপত্র রেখে রাস্তার পাশের পাহাড়ের মাথায় কালেক্টর সাহেবের অফিস অভিমুখে চলতে আরম্ভ করলাম। কর্ণপ্রয়াগে দুপুরের আহার না সেরে কি ভুলই করেছি। ক্ষুধার্ত অবসন্ন দেহে, বৃষ্টির মধ্যে খাড়া পাহাড়ে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসরস্বতীপ্রসাদ ওয়াটালের সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয়পত্র পেশ করলাম। ভদ্রলোক সদালাপী ও অমায়িক। তাঁর কেরাণীবাবু কদিন ছুটি নিয়েছেন। নিজেই আমার অনুমতি পত্র (ছাপানো পারমিট ফরম) লিখে সই করে দিলেন। তারপরে নানা বিষয়ে

আলাপ হল। ভদ্রলোক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ এবং পায়ে হেঁটে হিমালয়ের অনেক দুর্গম অঞ্চলে বেড়িয়েছেন। বললেন নন্দনকাননে এই সময় অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য ফুল আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। ঘাংরিয়ার সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে বললেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল ঘাংরিয়ার বনবিভাগের ডাকবাংলোতে থাকার সময় যথাসম্ভব সংক্ষেপ করতে হবে। বললেন কুয়ারী (Kuari Pass) গিরিবর্ত্ম বর্তমানে অগম্য। এদিকে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, শ্রীওয়াটাল আমাকে যত্ন করে চা বিস্কুট ও ভাজা খাওয়ালেন। আমার অনুরোধে ফোন করে জানলেন যে পিপলকুঠীর শেষ গেট অল্পক্ষণ আগেই আজকের মত চলে গেছে। তাঁর পরামর্শ মত বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে পূর্তবিভাগের অফিসে গিয়ে ডাকবাংলোতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে স্বল্পপত্র নিয়ে আবার সেই পাহাড়ের মাথায় ডাকবাংলোতে চড়া। অফিস, কালেক্টরী, আদালত, ডাকবাংলো সবই এই পাহাড়ের মাথায়। এঁকে-বেঁকে খাড়া চড়াই ভেঙ্গে সেখানে পৌঁছে চৌকীদারের দেখা মিললো না। দুটো ঘরই ভর্তি। একটাতে স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তার অস্থায়ীভাবে সপরিবারে আছেন। আর একটিতে আমার আসবার কিছু আগে একজন সরকারী কর্মচারীর আরদালী তাঁর মালপত্র তুলেছে বিনা অনুমতিতে। তাকে বললাম তার সাহেবকে ডেকে দিতে। এলেন শ্রীভর্মা। তাঁকে বললাম যদিও তাঁর পারমিট নেই, তাহলেও তাঁকে ঘরে ঠাঁই দিতে আমার আপত্তি নেই। এই বৃষ্টির মধ্যে ভদ্রলোক আর কোথায়ই বা যাবেন ?

শ্রান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দেহটাকে নিয়ে এবার পড়া গেল। স্নানের ঘরে কলের জলে মুখহাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলিয়ে বর্ষাতি চড়িয়ে আবার পাহাড়ের নিচে সেই বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে খাবারের দোকান অভিমুখে চললাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি, সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। লালাজীর দোকানে ঢুকে জানলাম ফুল্‌কা (রুটি) প্রস্তুত হতে একটু দেরী হবে। এক গ্লাস চায়ের কথা বলে কাঠের বেঞ্চিতে বসে দোকানের ব্যাটারীচালিত বেতারযন্ত্রে হিন্দি সিনেমার গান শুন্‌তে শুন্‌তে হঠাৎ চমক ভাঙ্গল নেহরুর নামে অহেতুক গালাগালিতে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে জানলাম যে ঐসব গান ও তার ফাঁকে ফাঁকে গালিগালাজ 'আজাদ কাশ্মীর' রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছে। আশ্চর্যবোধ হল, হিন্দু আর্য-সভ্যতার মূল ঘাঁটিতে অহিন্দুদের এই প্রচারকার্য এরা দিব্যি শুনছে। তারপরেই মনে হল, অশিক্ষিত এই জনতাকে আকর্ষণ করেছে সিনেমার সঙ্গীত।

তাঁরই ফাঁকে এই অপকীর্তি। আর স্থানীয় লোকেরা বেশ নির্বিকার হয়েই শুনছে।

বড় রাস্তার ধারে এই কাঠের দোকান। পেছন দিকটা ঢালু হয়ে ক্রমে বহু নিচে নদীতে মিশেছে। ভেতরে লম্বা টেবিল ও বেঞ্চের ব্যবস্থা। পেছনের জানলা দিয়ে অলকানন্দার শোভা মন্দ নয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হল। গরম গরম রুটি, ডাল ও সবজী খেয়ে ধীরে সুস্থে পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে ডাকবাংলোতে পৌঁছতে বেশ বেগ পেতে হল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চড়াই পথে টর্চলাইট না হলে চলা সম্ভব নয়।

চামোলী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩২০০ ফিট উঁচু। তার ওপরে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে বেশ শীত শীত লাগছে। ডাকবাংলোতে ফিরেও চৌকীদারের দেখা পেলাম না। বোধ হয় আমার দয়া গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয়েই শ্রীভর্মা চলে গেলেন অফিসারদের ক্লাবে রাত কাটাতে।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরে দড়ির কার্পেটমোড়া মেঝে, দরজা জানালায় পরিষ্কার পরদা। নেয়ারের খাটিয়ায় আরামে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে নিদ্রার চেষ্টা করি। সারাদিন যা ধকল গেছে। পাশের ঘর থেকে কচি ছেলের কান্নার আওয়াজ কানে ভেসে আসে। এক বৃদ্ধের ও একটি মেয়ের বাংলা কথাবার্তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ৪ ॥

পিপলকুঠী

অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গল। ঘুরবাহাদুর এসে হাজির হয়েছে। বাঁধাছাঁদা সেরে চৌকীদারের খোঁজ করি। এখানে গতকাল এলাম, রাতে থাকলাম, আজ চলে যাচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে এখনও দেখাই হল না। অগত্যা পাশের ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিতে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। জানলাম ইনিই সরকারী চিকিৎসক. ডাক্তার পাণ্ডে। আমার পারমিট, আট আনা বকশিশ ও ফরেস্ট অফিসারের নামে একটা চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম চৌকিদারকে দেবার জন্য। চিঠিটা ঘাংরিয়া, গোহনা ইত্যাদি স্থানের বনবিভাগের রেস্টহাউসে থাকবার ব্যবস্থার জন্য। ভোর সাড়ে ছয়টায় আবার বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। পাশের চায়ের দোকানে—লালাজীর কাছে চা ও দেশী

বিস্কুট খেয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। সকাল সাতটায় পিপলকুঠীর প্রথম গেট। কিন্তু নন্দপ্রয়াগ থেকে প্রথম বাস এলো সাড়ে দশটায়, নীলগিরি অভিযাত্রীদের নিয়ে।

গতকাল সারারাত্রি অল্প অল্প বৃষ্টির পরে আজ সকাল থেকে ক্রমেই বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করছি, এক যাত্রীদলের সঙ্গে আলাপ হল। গুজরাতী একটি ভদ্রলোক। আমারই বয়সী, মাদ্রাজে ব্যবসা করেন। কেদার-বদরী দর্শন করে ফিরছেন। শুনলাম বদরিনাথের পথে জোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর ও লাম্বগড় ছাড়া অন্যত্র আশ্রয় মিলবে না। ওঁরা খচ্চরের পিঠে চড়ে পরিক্রমা করেছেন। মতিহারির (বিহার) এক দেহাতী পরিবারের সঙ্গেও আলাপ হল। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় ষাট বৎসর। সঙ্গে স্ত্রী ও অতিবৃদ্ধা মা আছেন। এঁরা কেদারনাথ হয়ে এখন বদরিনাথ চলেছেন। পায়ে হেঁটে এবং মোটরবাসে। তাঁরা রুদ্রপ্রয়াগ কুণ্ডচটি হয়ে কেদারনাথ দর্শন করে ফেরার সময় গুপ্তকাশী থেকে অন্যপথে তুঙ্গনাথ দর্শন করে চামোলীতে এসেছেন। এপথে মোটরবাস চলে না। পায়ে হেঁটে, ডাণ্ডী অথবা কাণ্ডীতে চড়ে যেতে হয়।

বাস ডিপোর ম্যানেজার আমাকে নীলগিরি অভিযাত্রীদের বাসে তুলে দিলেন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেলা এগারটায় বাস ছাড়ল। বাসে আলাপ হল দলের সকলের সঙ্গে। শুনলাম এঁরা গতকাল সারারাত 'সোনলার' ধসের কাছে অনিদ্রায় এবং অনাহারে কাটিয়েছেন। কিন্তু সেজন্য কোন ক্ষোভ নেই। প্রচণ্ড উৎসাহ দলের সবার চোখেমুখে এবং কথাবার্তায়। দলের নেতা অমূল্য সেন বললেন, 'আমরা পিক্‌নিক্ করব নীলগিরির চূড়ায়।'

হঠাৎ নিজের দেশের (উত্তর বঙ্গ) কথার টান কানে আসতে সেদিকে ফিরে চাইলাম। দলের প্রবীণতম সদস্য ছাপ্পান্ন বৎসরের প্রৌঢ় শৈলেশ চক্রবর্তী। আলাপ হল। আমার অনুমান নির্ভুল প্রতিপন্ন করে তিনি জানালেন তাঁর বাড়ী রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমায়—বাসুদেবপুর গ্রামে। বড় আনন্দ ও গর্ব হল এমনি উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় প্রায়-বৃদ্ধের এমন অসমসাহসিক কাজে। ছোটখাটো শীর্ণ মানুষটির সদাপ্রফুল্ল মুখে সর্বদা হাসি লেগে আছে। আমাকে জানালেন যে দুবছর আগে তিনি গোমুখী থেকে গঙ্গোত্রী ও চতুরঙ্গী হিমবাহ হয়ে বদরিনাথ গিয়েছিলেন ছাতু ও চিড়া খেয়ে। নমস্কার জানালাম তাঁর যুবকোচিত উৎসাহ ও কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতাকে। আলাপ হল চঞ্চল

মিত্র, কমল গুহ, পিনাকী সিংহ, দেবীদাস দত্ত এবং দার্জিলিংয়ের শেরপাদের সঙ্গে। আমার ও ঘুরবাহাদুরের বাসের ভাড়া আমি একরকম জোর করে তুলে দিলাম পিনাকীবাবুর হাতে।

বৃষ্টির মধ্যে বাস চলল আমাদের নিয়ে, মাটি ও পাথরের উঁচুনিচু ভাঙ্গাচোরা রাস্তা সন্তর্পণে ডিঙ্গিয়ে। বহু নিচে অলকানন্দা বয়ে চলেছে মহাবেগে। পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে বিরহীগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম 'বিরহী'। পথ থেকে অভিযাত্রী দলের প্রাণেশ চক্রবর্তী ও একজন শেরপাকে বাসে তুলে নেওয়া হল। ওরা দুজনে অভিযাত্রীদের সন্ধানে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে পিপলকুঠী থেকে চামোলী যাচ্ছিল। অভিযাত্রীদের গতকালই পিপলকোঠীতে পৌছনর কথা ছিল। প্রাণেশ দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, বয়স বাইশ বছর। তার কর্তব্যনিষ্ঠা খুবই ভাল লাগল।

বিরহীগঙ্গার সেতু পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই ভেঙ্গে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পাথর মেশানো উঁচুনিচু রাস্তা ধরে বাস অতি কষ্টে আমাদের নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে গতি অতি মন্থর, ঘণ্টায় দু তিন মাইলের বেশী নয়। সেতু পার হয়ে অল্পদূরে গিয়ে আবার অলকানন্দার ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-ফিরে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলেছে হিমালয়ের গভীরে। এমনি একটানা ছ মাইল গিয়ে চামেলী থেকে এগার মাইল দূরে পিপলকুঠীতে বাস-যাত্রার বিরতি।

বেশ বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যকেন্দ্র এই পিপলকুঠী। বাজারের মধ্যে বাসডিপোর সামনে গাড়ী থেকে নামলাম। এখান থেকে বাসের রাস্তা আরও বিশ মাইল, জোশীমঠ পর্যন্ত গিয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বহু জায়গায় ধস নেমে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে গত দু মাসের উপর পিপলকুঠীতেই বাস-যাত্রার বিরতি। পূর্ত বিভাগের শ্রমিকরা রাস্তা মেরামত করছে রাতদিন। এখন শুনছি সৈন্যবাহিনীর জীপ গাড়ী কিছুদূর পর্যন্ত চলাচল করছে কোন রকমে।

বৃষ্টির মধ্যে বেলা দেড়টায় পিপলকুঠীতে পৌছলাম। বাজারের ওপরে পাহাড়ের মাথায় পূর্তবিভাগের অফিসে গিয়ে চামোলীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীওয়াটালের চিঠি পেশ করলাম। স্থান মিললো ডাকবাংলোতে—সুন্দর কাচের জানালা-ঘেরা একটা ছোট ঘরে। আসলে সেটা বসবার ঘর, স্থানাভাবে সেটাকে আমার রাত্রিবাসের উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। এস্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৩০০ ফুট। সুন্দর বাগানে ঘেরা পিপলকুঠী ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে চারিদিকের শোভা বড়ই সুন্দর। চতুর্দিকে উন্নত পাহাড়ের শ্রেণী, তার মাঝে

শস্যশ্যামল উপত্যকার বুক চিরে একটা চওড়া রাস্তা। দুপাশে দোকান, বাজার, বাস ডিপো, যাত্রীনিবাস। দূরে সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প। বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে অল্প রোদ পাহাড়ের মাথাগুলো হলুদ রংয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। ছবি তুললাম সেই নয়ন মনোহর দৃশ্যের।

বেলা দুটো বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিচে এলাম। বাজারের একটা দোকান থেকে ভাত, ডাল একটু তরকারী ও কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে দ্বিপ্রহরের আহার সেরে এসে কম্বল গায়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। কন্‌কনে শীত ও তার সঙ্গে বরফ ছোঁওয়া হাওয়া। গরম জামাকাপড় পরে নিয়ে বিকেল পাঁচটায় বাজারে নেমে, যাত্রীনিবাস টিনের ছাউনীটার নিচে নীলগিরি অভিযাত্রীদের গোছগাছ দেখি। দেড়টন মালপত্র সবকিছু খুলে নূতন করে সাজানো হচ্ছে। রসদ, জ্বালানী, সাজ-সরঞ্জাম। কিছু যাবে খচ্চরের পিঠে, কিছু কুলীদের পিঠে। 'রুকস্যাক' এ ভরে সর্বসময়ের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বইবেন সদস্যেরা। এলুমিনিয়মের ফ্রেমে বাঁধা প্রকাণ্ড ক্যানভাসের ঝোলা এই 'রুকস্যাক'। সারা পিঠ জুড়ে সমস্ত ওজনটা সমভাবে ছড়িয়ে দেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই রুকস্যাক পিঠে নিয়েই এঁরা চড়বেন বরফের পাহাড়ে। ভেতরে আছে ছোট্ট হাল্‌কা তাঁবু, হাওয়াভরা শয্যা (Air Mattress), রাতে ঘুমানোর লেপ (Sleeping Bag) জামাকাপড়, ঔষধপত্র, খাবার, প্লেট ও মগ, ক্যামেরা, লেখবার সরঞ্জাম, কিছু দড়ি, টর্চলাইট, ছুরি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ৩০।৪০ পাউণ্ড (১৫।২০ সের) ওজন সবশুদ্ধ। দড়ি দিয়ে বাঁধা, দুই হাতের মধ্যে দিয়ে পিঠে বেধে নিয়ে পথ চলা। হাতে থাকে তুষার গাঁইতি (Ice Axe)। দেখলাম পলিথিনের পাঁচ গ্যালন বোতলে কেরোসিন তেল পাঠিয়েছেন বার্মাশেল কোম্পানী। বোতলগুলি পিঠে বেঁধে নেবার জন্য হুক ও ফ্রেম করা। অন্ধকার হয়ে যেতে হ্যাজাক জ্বেলে মালপত্র সাজানো হচ্ছে। রসদ আছে চাল, আটা, আলু, ঘি, তেল প্রভৃতি। একটা ছোটখাটো সৈন্যবাহিনী। বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ওদের প্রস্তুতি দেখছি। রেল ও বাসপথের শেষে এখান থেকে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে চড়া ওদের শুরু এবং আমারও। দার্জিলিংয়ের শেরপাদের সঙ্গেও আলাপ হল। সদাহাস্যময়, বলশালী ও পরিশ্রমী এই পৃথিবী বিখ্যাত শেরপারা—৺বাবার বাড়ীতে যেতে হলে, তাঁর অনুচরদের সাহায্য অপরিহার্য। অভিযাত্রীদের সাজ সরঞ্জাম দেখি আর মনে মনে টুকে নিই, আমার ভবিষ্যতের হিমালয়ের পথে কোন কোন জিনিসগুলো নেওয়া দরকার।

শিক্ষার শেষ নেই। মনটাকে সর্বদা তৈরী রাখা দরকার সদাজাগ্রত ছাত্রের মত, যার যেটুকু শিক্ষণীয় ও ভালোগুণ সেটুকু গ্রহণ করা, বাহুল্য বর্জন করে।

বৃষ্টি থেমেছে, রাস্তার দু পাশের দোকানীরা কেরোসিনের আলো জ্বেলেছে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আবার সেই নোংরা দীনহীন দোকানে, ধনী-দরিদ্র সকলে একই সঙ্গে একই রকম খাওয়া। এদের নোংরামির সঙ্গে ক্রমশই অভ্যস্ত হচ্ছি। রাতের খাওয়া সমাধা করে পাহাড়ের মাথায় ডাকবাংলোতে ফিরলাম বৃষ্টি অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আশা হচ্ছে আগামীকাল আকাশ পরিষ্কার হবে। পাশের ঘরে অভিযাত্রীদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে এলাম। প্রচণ্ড শীতে দুখানা কম্বলমুড়ি দিয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ৫ ॥

পদযাত্রা

ভোর ছটায় ঘুম ভাঙল। আলস্য ভেঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে, বাধাছাদা সেরে চৌকিদারের কাছে বিদায় নিয়ে বাজারে নামলাম। একটা দোকান থেকে গরম টাট্‌কা ভাজা জিলাপী ও চা খেয়ে রওনা হলাম পদযাত্রায়। নীলগিরি অভিযাত্রী দলের গোছগাছ চলছে। ওদের খচ্চরের দল এসে পৌঁছায় নি। পিপলকুঠীকে পেছনে রেখে সকাল ৭।৩৫ মিঃ এগিয়ে চলি।

আকাশ পরিষ্কার। মিষ্টি রোদ উঠেছে। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, তাদের গায়ে দু-এক মুঠো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ লেগে রয়েছে। বহু নিচে অলকানন্দা বয়ে চলেছে। মোটরের ভাঙ্গাচোরা পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলেছি। প্রাণে বড় আশা! চারিদিকের নয়নসুখকর দৃশ্যাবলীর মাঝ দিয়ে আমি চলেছি এগিয়ে, আনন্দে পুলকে শিহরিত মন—দুচোখ দিয়ে আপনি নেমে আসে ধারা। গলা ছেড়ে গান করতে করতে চলেছি। মাঝে মাঝে ধস নেমেছে। অতি সাবধানে পার হয়ে চলেছি। ধসের স্তূপের ওপরে দ্রুত পা ফেলে পার হতে হয়, পা হড়কালে অথবা পায়ের তলার মাটি ধসে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুই যদি লেখা থাকবে, তার জন্য এত তদ্বির করে এতদূরে আসা কেন? বাড়ীতে স্নানের ঘরে পা পিছ্‌লে পড়ে মরলেই হয়! অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে এত কাদা হয়েছে যে জুতা বসে যাচ্ছে। পাহাড়ী পথে চলার জন্য বিশেষভাবে তৈরী, বড় বড়

ট্রেডওয়ালা মোটা ক্যানভাসের জুতা, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত আমায় নিয়ে চলেছে দুর্গম থেকে দুর্গমতর পথে—হিমালয়ের অন্দরমহলে।

প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ একভাবে চলে, গরুড়গঙ্গার সেতু পার হলাম। দূরে, বহুদূরে আকাশের গায়ে অলকানন্দার নিচে নামবার পথ লক্ষ্য করি। এই প্রথম তুষারশৃঙ্গের দেখা পেলাম। আনন্দে পুলকে ভরে ওঠে মন। যেন বহুদিন পরে স্বদেশে ফেরার আনন্দ! হিন্দু আর্যসভ্যতার মূলস্তম্ভ এই-তুষারমৌলী দেবতাত্মা হিমালয়ের অমল ধবলরূপ চাক্ষুস দেখতে পেয়ে দেহের ভেতরে আর্যশোণিত, পূর্ণ চন্দ্রালোকে সমুদ্র বারিরাশির মত ফুলে ওঠে, নেচে ওঠে!

গরুড়গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমে একটা ছোট্ট কুটির আছে। স্থানটি এখন জনমানবশূন্য। হয়ত যাত্রীসমাগমে এখানে চায়ের দোকান বসে। ক্লান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম করে, আবার পথ চলে। দরজা-জানালাবিহীন ছোট্ট ছাউনীর ধারে পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আবার পথ চলা শুরু। পথে মাঝে মাঝে রাস্তা মেরামতের কাজ চলেছে।

আরও আড়াই মাইল পথ চলে, বেলা ৯।৫০ মিনিটে 'বেলাকুচী'। বেশ জনবহুল স্থান। একটা বড় ঝরনা এসে অলকানন্দায় পড়েছে। তারই পাশে গাছপালায় ঘেরা এই স্থান পাহাড়গুলো নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাদের ভীড় ঠেলে নদী পথ করে নিয়েছে। সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি ও অনেকগুলো দোকান—থাকবার ও খাবার জায়গা। পিপলকুঠী থেকে যাঁরা একদিনে বিশ মাইল পথ হেঁটে জোশীমঠে যেতে পারবেন না, তাঁদের পক্ষে এখানেই রাত্রিবাস প্রশস্ত। পিপলকুঠী থেকে বেলাকুচীর দূরত্ব ছয় মাইল। এর পরে আরও দুএকটা জায়গায় হয়ত স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু তা অনিশ্চিত। হিমালয়ের এইসব পথে বেশী ঝুঁকি না নেওয়াই মঙ্গল।

একটা দোকানে পকোড়া, পেড়া ও গরম দুধ খেয়ে একটু বিশ্রাম করে, ক্যামেরা ও জলের বোতল দুই কাঁধে ঝুলিয়ে আবার পথ চলা শুরু করা গেল। বেলা ১০।৫০ মিঃ। আজ পথের সাথী, চামোলীতে দেখা কেদারনাথ প্রত্যাগত মতিহারীর সেই দেহাতী পরিবার। গতকাল ওঁরা চামোলী থেকে বাস না পেয়ে, পায়ে হেঁটে পিপলকুঠীতে এসে রাত কাটিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষোভ বা দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই তাঁদের মুখে চোখে। নির্বিকার চিত্তে পুঁটুলি মাথায় নিয়ে চলেছেন বদরীনাথ অভিমুখে, লক্ষ্য শুধু এক······।

অলকানন্দার সেতু পার হয়ে বাঁক ফিরতেই দেখি পাতাল-গঙ্গা এসে মিশছে অলকানন্দায়। প্রকাণ্ড একটা গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড়, ডিনামাইট দিয়ে কেটে তৈরী হয়েছে পথ, এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে পথ। পাহাড়ের ওপর থেকে পথের ওপরে টপ্‌টপ্‌ করে বৃষ্টির মত জল পড়ছে সদা সর্বদা।

একটা পাকদণ্ডী ধরে উপরে উঠে খানিকটা পথ সংক্ষেপ করা গেল। প্রায় তিন মাইল পথ এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনেই মারাত্মক ধস—দুরূহ বাধা। পর্বতপ্রমাণ ঝুরো মাটি ও পাথরের স্তূপ। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে আল্‌গা মাটির ওপরে পা দিয়ে কেমন করে এগিয়ে যাবো? ঝুরো মাটির ও পাথরের ওপরে আমার দেহের ভারে আবার যদি ধস নামে? তাহলে যে নিশ্চিত মৃত্যু—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। আমার মোটবাহক ঘুরবাহাদুর কিন্তু এগিয়ে চললো। মন বলে 'তুমিও পারবে'। ইষ্টদেবীকে স্মরণ করে দ্রুত পার হয়ে আসি! আর একটা প্রকাণ্ড বাধা অতিক্রম করার আনন্দ হয় মনে। পেছন থেকে ব্যাকুল আহ্বান ভেসে আসে—মতিহারীর বৃদ্ধা আমায় ডাক্‌ছেন, পার করে দিতে। সাড়া দেব কি? নিজেই যে কত ইতস্তত করেছি মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে। কিন্তু অবাক হই নিজের সাহস দেখে। সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আবার ধস পার হয়ে বৃদ্ধার হাত শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলি,—পার করবার মালিকই নিরাপত্ত' দেখবেন। ভয় দূর হয়। ধীরে ধীরে সবাই পার হয়ে আসেন। পরে শুনেছিলাম এই ধস পার হতে গিয়েই নীলগিরি অভিযাত্রীদের একটা খচ্চর গভীর খাদে পড়ে মরেছে ও একজন কুলী সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। পাহাড়ের পথে চল্‌বার সময় পায়ের দিকে সর্বদা নজর রাখতে হয়। শরীরের স্নায়ুতন্ত্রী যখন দুর্বল ও অবসন্ন থাকে, তখন পদক্ষেপ হয়ে পড়ে অনিশ্চিত।

আরও কিছুটা চড়াই পথ পার হয়ে, বেলাকুচী থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে একটা ঝরনার ধারে একটিমাত্র ছোট দোকানে এসে বসি। বেলা বারটা বেজে গেছে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে পথ চলে ঘামে ভেজা জামা, গেঞ্জি খুলে দোকানের খড়ের চালে শুকোতে দিলাম। চায়ের ফরমাশ দিয়ে বসি বিশ্রাম করতে। মতিহারীর যাত্রীরা এইখানে তাদের দুপুরের খাওয়ার উদ্যোগ করেন। শুনলাম ওপরে পুরনো রাস্তার ধারে গোলাপকুঠীতে বাজার আছে, সেখানে রাতের আশ্রয় মেলে। এখান থেকে পিপলকুঠী নয় মাইল, আর জোশীমঠ এগার মাইল। ১২।৪৭ মিনিটে এক গ্লাস চা খেয়ে আবার চলা শুরু।

আরও দুই মাইল হেঁটে বেলা দেড়টায় হেলাঙ্গ। প্রকাণ্ড পাহাড়ের সামনে গুটি দুই তিন দোকান। এখানে দক্ষিণ থেকে কল্পগঙ্গা ও উত্তর থেকে কর্মনাশী এসে অলকানন্দায় পড়েছে। প্রচণ্ড রোদের তেজে ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে পথ চলি। একটানা বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না। তাছাড়া পথে ছায়া বড় একটা মেলে না, কাজেই চলার গতি হয় ধীর। দোকানে জিজ্ঞেস করে জানলাম খাবার কিছু নেই। এ পথে এখন যাত্রীসমাগম খুবই কম, নেই বললেই চলে। বেলা সাড়ে এগারটার পরে খাবার কিছু মেলে না। দরিদ্র দোকানদাররা অযথা জ্বালানী কাঠ পোড়ায় না। তবে নিজে রান্না করলে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু রান্নার ঝামেলা আমার পোষাবে না। অতএব 'তারা' বলে কর্মনাশীর সেতু পার হয়ে আবার চলা শুরু করলাম।

'হেলাঙ্গ' ছেড়েছি বেলা ১।৪৭ মিঃ। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তেজ। প্রায় এক মাইল পথ চলে, পাকদণ্ডী পথে খাড়া চড়াই শুরু করেছি। মোটরের পথ অনেক ঘুরে ঘুরে, আমি চলেছি পাকদাণ্ডী দিয়ে। অনেক পথ হাঁটা কম হবে। কিন্তু খাড়া পাকদণ্ডী দিয়ে চলার পরিশ্রমও গুরুতর। কিছু দূরে এসে দেখি একটা ছোট্ট দোকান। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় প্রচণ্ড রোদের তেজে ১০।১২ মাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। দোকানে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম—কিছু পাওয়া যাবে কিনা। কালো রংয়ের নোংরা পেঁড়া ও এক গেলাস চা খেয়ে, খানিকটা বিশ্রাম করে আবার পাকদাণ্ডী ধরে চড়াই। এদিকে ঘুববাহাদুরের দেখা নেই। সে আমায় ছেড়েছে হেলাঙ্গ থেকে। হয়ত মালপত্র নিয়ে পাকদাণ্ডী দিয়ে না এসে সোজা পথেই চলেছে।

অতি সাবধানে পা ফেলে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠ্‌ছি। সারা শরীর, বিশেষ করে ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়া, টন্‌টন্ করছে। ঘন ঘন পিপাসা পাচ্ছে, বোতল থেকে জল খাচ্ছি। একটু দাঁড়াই, আবার চলি। বিছুটির জঙ্গলে হাত লেগে জ্বলছে। এ পথে হাতকাটা জামা পরার অনেক অসুবিধা। পথের দুধারে কাঁটা গাছ ও পাহাড়ী বিছুটির জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু-একটা 'কোদো' (মাড়োয়া) ও রামদানার ক্ষেত। ছোট ছোট ঝরনা, পাহাড়ীদের কুটীর। ক্রমেই উপরে উঠছি। প্রায় অর্ধেক চড়াই শেষ করে একটা দোকানের ধারে আবার একটু বসি। এখানে চা ও পকোড়া পাওয়া গেল। দোকানের পেছনদিক দিয়ে প্রকাণ্ড একটা ঝরনা প্রবলবেগে নিচের দিকে বয়ে চলেছে, তার ওপরে পানচাক্কি। 'কাঠের চাকার (প্রপেলার) মধ্য দিয়ে ঝরনার জল

তীরবেগে নিচে নামছে, চাকার মাথায় পাথরের চাকি বসানো আছে, গম পেষার জন্য। খরস্রোতা ঝরণা পার হবার উপায় খুঁজছি। একজন পথিক সেপাই সাগ্রহে আমায় পিঠে করে পার করে দিল। তার মুখে শুনলাম সে তিব্বত ও নেপাল সীমান্তের শেষ ভারতীয় গ্রাম গারবিয়াং থেকে ছুটিতে দেশে চলেছে। জোশীমঠের কাছে তার বাড়ী। তার অযাচিত সাহায্য না পেলে খুবই মুস্কিল হত।

আবার চড়াই। শরীর আর বয় না। মন বলে—হেরে গেলে। নূতন উৎসাহ নিয়ে আবার চড়াই ভাঙ্গি। বিছুটির জ্বালায় হাত জ্বল্‌ছে, রোদের তেজে মাথা, মুখ ও চোখ জ্বল্‌ছে। ঘন ঘন তৃষ্ণা পাচ্ছে। কিন্তু সব কষ্টেরই শেষ আছে। শেষ দু এক কদম পথ পাথরের চাঁইগুলোকে আঁচড়ে কোনরকমে দেহটাকে টেনে তুললাম মোটরের রাস্তায়। বেলা সাড়ে তিনটা বেজে গেছে। রোদের জ্বালায় রাস্তার পাশে একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা কাঁটাগাছ আঁকড়ে একটুখানি ছায়ায় বসে ধুক্‌ছি। সারা শরীর জ্বল্‌ছে—পুড়ছে। শিরদাঁড়াটা বেজায় টন্‌টন্‌ করছে। ঘোরা পথে আমার মালবাহক ঘুরবাহাদুর এখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রায় আধ ঘন্টা সেই কাঁটাগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথ চলা। এখান থেকে জোশীমঠ চার মাইল। পা টল্‌ছে, ঘাড় ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই জোশীমঠে পৌঁছতে হবে। এ পথে অন্ধকারে পথ চলা সম্ভব নয়। পা হড়কালে কয়েক হাজার ফুট নিচে চলে যেতে হবে। বেশ মেঘ করে এসেছে, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—বৃষ্টি নাম্‌বে। এক মাইল পথ চলে একটা ছোট্ট চটি, দুটো চায়ের দোকান, নাম 'ঝড়কুলা'। কিন্তু সেখানে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলতে চেষ্টা করি, পা দুটো আর চলতে চায় না। শিগ্‌গিরই বৃষ্টি নামবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টি নামল টিপ্‌ টিপ করে। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নেই। ঘুরবাহাদুরের কাঁধে স্যুটকেশের মধ্যে বর্ষাতি আছে, বের করবার সময়টুকুও নষ্ট না করে বৃষ্টির মধ্যেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

জোশীমঠের এক মাইল আগে 'সিংহদ্বার'। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। এখানে পাহাড়ের গায়ে সৈন্যবাহিনীর ছাউনী ও হাসপাতাল। সিংহদ্বার থেকে দুটো পথ জোশীমঠের দিকে গেছে। একটি মোটরের পথ, যে পথে আমি এসেছি। আর একটি উপর দিয়ে,এটিও মোটর চলাচলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে উপরের পথ ধরে এগিয়ে চলি পূর্তবিভাগের ডাকবাংলো অভিমুখে।

ডাকবাংলোতে পৌঁছে চৌকীদারের খোঁজ করি। বিনা পারমিটে সেখানে আশ্রয় মিলল না। অগত্যা চললাম বিড়লা রেস্ট-হাউসের দিকে। পিপলকুঠীতে প্রাণেশ বলেছিল অভিযাত্রীদলের ট্রান্সপোর্ট অফিসার বীরেন সরকার আছে বিড়লা রেস্ট-হাউসে। সেখানে পৌঁছে ম্যানেজার পাণ্ডেজীকে বীরেনের কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বিশেষত্ব বর্জিত একটি ছোট্ট গোলগাল চেহারার ২৪।২৫ বছরের ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। এই কি রূপকুণ্ড নন্দাখাত খ্যাত, স্বামী প্রণবানন্দ ও উমাপ্রসাদবাবুর স্নেহধন্য বীরেন সরকার! আশ্রয় চাই—বলতেই সাগ্রহে বীরেন আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে ও সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড মেঘ গর্জন ও অঝোরে বৃষ্টি, যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেতে দড়ির কার্পেটমোড়া সুন্দর পরিষ্কার জায়গায় জিনিসপত্র রেখে বসে পড়েছি মেঝেতে। মুখহাত ধোবার মত পরিশ্রম করার শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। বৃষ্টি একটু কমতেই বীরেনের তাগাদায় নিচের পাহাড়ে বাজারে খেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হল। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ নেই। ঘামেভেজা গায়ের জামা কাপড় বদলিয়ে গরম পোশাক পরে বর্ষাতি চড়িয়ে বীরেনের সঙ্গে চললাম বাজারের দিকে। পাকদণ্ডী দিয়ে, নালা ও নর্দমা ডিঙ্গিয়ে। বিড়লা রেস্ট হাউসের কাছে কোন দোকানপাট নেই। অন্ধকারে একটা ছোট নালা পার হতে গিয়ে আছাড় খেলাম। অসমান উৎরাই পার হয়ে বাজারে এসে 'বদরিনাথ ক্যানটিন' নামে একটা খাবার দোকানে ঢুকে, বারান্দায় বর্ষাতি ঝুলিয়ে রেখে, দুজনে খেতে বসলাম। জোশীমঠের সবচেয়ে ভালো ও আধুনিক খাবার জায়গা, তবে দাম একটু বেশী। ভাত, রুটি, ডাল এবং দু রকম সব্‌জি—১'২৫ পয়সায়। খাওয়া শেষ করে ডেরায় ফিরলাম রাত সাড়ে আটটায়। বৃষ্টি থেমেছে। ঘুরবাহাদুর বসেছিল মালপত্র আগলিয়ে। তাকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে বিদায় দিলাম রাতের মত।

তারপরে বীরেনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প আরম্ভ হল। এত অল্পসময়ে এমনভাবে আপন করে নিতে আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি। যেন কতকালের পরিচিত। মনে হয় কোথায় যেন একটা আত্মিক মিল আছে ছেলেটির সঙ্গে। বীরেনের জীবনের কথা, তার হিমালয়ের অভিজ্ঞতার কথা—রূপকুণ্ড ও নন্দাখাত অভিযানের কাহিনী, তার জীবনের উদ্দেশ্য, আশা আকাঙ্খা...... কথা আর ফুরায় না। রাত্‌ অনেক হয়েছে, আকাশ নির্মল, তারা ঝলমল

করছে, সেই সঙ্গে হাড়কাঁপানো শীত। ডবল গরমপোশাক পরে তিনখানা কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে গল্প করতে করতে ঘুম……।

॥ ৬ ॥

জোশীমঠ

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গে বীরেনের ডাকে। জানলা খুলে দিতে সকালেব সোনালী রোদে ঘর ভরে গেল। একটা পাহাড়ের উপরে অতি সুন্দর বাগানে ঘেরা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী। আধুনিক কায়দায় তৈরী এই বিড়লা রেস্ট-হাউসস্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বারান্দার দেওয়ালে আয়না লাগানো। দোতলার ঘরগুলো সোফাকোচ দ্বারা এবং একতলার ঘরগুলো দেশী কায়দায় সাজানো। জোশীমাঠের সবচেয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত এই বাড়ী অল্পদিন হল তৈরী হয়েছে। বাগানে বড বড় গাঁদা, জিনিয়া, ডালিয়া ও নানা রকমের ফুল। শুনলাম বৃষ্টির জন্য অনেক ফুল ঝরে গেছে। এবাড়ীতে থাকবার অনুমতি পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করতে হয়। আমি আশ্রয় পেয়েছি বীরেনের দৌলতে।

ম্যানেজার পাণ্ডেজীর বাসা থেকে বীরেন এক কেটলী গরম জল নিয়ে এল। আমার ব্যাগ থেকে কফি, গুঁড়া দুধ ও চিনি বের করে কাজুবাদাম ও চিজ্ সহযোগে প্রাতরাশ করা গেল। তারপব ঠাণ্ডাজলে স্নান সেরে ক্যামেরা নিয়ে পথে বের হলাম দুজনে। বেলা দশটা বাজে। আজকের দিনটা জোশীমঠে বিশ্রাম ও পাহাড়ের উচ্চস্থানে (High altitude) আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া। জোশীমঠের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬১০০ ফুট। যদিও High altitude একে বলা চলে না, আসলে শরীরটা বিশেষ করে পা দুটো বিশ্রাম চাইছে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্ভূত এই জোশীমঠের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত পবতারোহী ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন 'threshold of the high Himalayas'। পার্বত্য সৌন্দর্যে পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ স্থানগুলির অন্যতম এই গাড়োয়াল হিমালয়। জোশীমঠের বহু নিচে দিয়ে অলকানন্দা বয়ে চলেছে। এখান থেকে দু হাজার ফুট নিচে বিষ্ণুপ্রয়াগ—হিমালয়ের পঞ্চ-প্রয়াগের অন্যতম—প্রসিদ্ধ তীর্থ। পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে গাড়োয়ালী গ্রাম। ২।৪টা ছোট ছোট বাড়ী এবং তাদের উপরে ও নিচে পাহাড়ের থাকে থাকে (Terraced cultivation) শস্যক্ষেত্র। এখানে উৎকৃষ্ট বাসমতী চালের চাষ

হয়। তবে চাষের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। তাই উত্তর প্রদেশ সরকার বিষ্ণুপ্রয়াগের কাছে একটা জলাধার (Dam) তৈরী করছেন। জোশীমঠের পাহাড়ের উপরে আপেল, নাসপাতী, পীচ্ প্রভৃতি ফলের চাষ কয়েক বছরের চেষ্টায় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তবু স্থানীয় অধিবাসীরা বড় গরীব। শিল্পকর্মের বিশেষ ব্যবস্থা না করতে পারলে এদের দারিদ্র্য সহজে ঘুচবে না। বড় রাস্তা বলতে মাত্র দুটি। বাকী সব সঙ্কীর্ণ উঁচুনিচু, নোংরা ও কিম্ভূত-কিমাকার। খাবার জিনিসপত্রের দাম—জিলাপীর সের আড়াই টাকা, কাটা নিম্‌কী ২·০০ টাকা, সিঙ্গাড়া প্রতিটি দুই আনা (১২ পঃ), দই দু টাকা সের, আহার জন প্রতি ৭৫ পঃ থেকে ১·২৫ পঃ। চাল ·৲ টাকা সের, ডাল ৮৭ পঃ সের। সারা বাজার খুঁজেও একটা লোহা বাঁধানো লাঠি পেলাম না। এপথে চলবার জন্য লাঠি অপরিহার্য। হরিদ্বার অথবা ঋষিকেশ থেকেই কেনা দরকার। প্রথমে সিংহদ্বার দিয়ে নিচে নেমে ঘুরে বাজারে গিয়ে একটা দোকান থেকে ভাত, ডাল, সব্‌জি ও দই খেয়ে পাশেই ডাকঘরে গিয়ে বাড়ীতে একটা চিঠি লিখলাম। এখানে পোস্টাফিসে দুপুরে সাড়ে এগারটার পর খাবার ছুটি।

জোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্যের উত্তর ধাম। উপরের পাহাড়ে শঙ্কর মঠ আছে, এবং জগৎগুরু শঙ্করের তপস্যার স্থান একটা গুহাও আছে। বদরিনাথের পূজারী রাওয়াল মহাশয় শীতকালে এই স্থান থেকে বদরিনাথের উদ্দেশে পূজা করেন। সে সময় বদরিকাশ্রম বরফে ঢাকা থাকে। নৃসিংহবদরী অন্যান্য মন্দির এখানে আছে। জোশীমঠ থেকে একটা রাস্তা ধৌলীগঙ্গার ধার দিয়ে 'তপোবন' হয়ে কুয়ারী গিরিবর্ত্মের (Kuari Pass—12000 ft.) মধ্য দিয়ে কুমায়ুনের দিকে গেছে। ধৌলীগঙ্গার পথে ভবিষ্যবদরী বার মাইল দূরে অবস্থিত। পথে কোন চটি নেই। এই পথের শেষে বিখ্যাত নিতি গিরিবর্ত্ম (Niti Pass), ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রাচীন পথ (Trade Route)।

নৃসিংহ বদরী—ভগবান বিষ্ণুর মন্দির। কিংবদন্তী আছে, প্রাচীনকালে এক পরাক্রান্ত রাজার রাজধানী ছিল এই স্থানে। একদিন রাজা শিকারে গেছেন, প্রাসাদে রয়েছেন রাণী, এমনি সময়ে ভগবান নৃসিংহ অবতার মানুষের রূপ ধরে অতিথি হয়ে এলেন রাজ বাড়ীতে। রাণীর সেবায় স্নানাহার সমাপ্ত করে ভগবান রাজার পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম করছেন, সেইসময় রাজা ফিরে এসে তাঁর ঘরে

অন্য পুরুষের অবস্থিতিতে ক্রোধান্ধ হয়ে তলোয়ারের আঘাতে নৃসিংহ দেবের একখানা হাত কেটে ফেললেন। কিন্তু মহা আশ্চর্য হয়ে রাজা দেখলেন যে ক্ষতস্থান থেকে রক্তের বদলে দুধ বেরুচ্ছে। ভগবান বিষ্ণু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, এই পাপের ফলে রাজার রাজত্ব, রাজধানী এবং বংশ পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাবে পৃথিবী থেকে।' অনুতপ্ত রাজা নৃসিংহদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। অতিথি অনুসারে নাকি বিগ্রহের হাত ছোট বড় হয়। যেদিন ঐ বিগ্রহের আঘাত পাওয়া হাতখানি আপনিই খসে পড়বে, সেইদিন বর্তমান বদরীনাথের মন্দির এবং যাবার পথ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপর থেকে ভগবান বিষ্ণুর পূজা চলবে ভবিষ্যবদরীর মন্দিরে।

এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর বর্ণনা আছে বিখ্যাত পর্বতারোহী এইচ. ডাব্লু টিল্ম্যানের 'The Ascent of Nanda Devi' বইতে।

গতকাল রাত্রে আশে পাশের পাহাড়ে বরফ পড়েছে, চূড়াগুলো সাদা হয়ে আছে। দু একটা ছবি তুলে, বাজারের পথ ঘুরে উপরের বড় রাস্তায় পৌঁছে, সিংহদ্বারের কাছে একটা পাহাড়ের মাথায় প্রায় ছয় শ ফিট খাড়া পাকদণ্ডী চড়াই উঠে, বনবিভাগের জেলা অফিসে পৌঁছলাম। রেঞ্জার শ্রীপুরোহিতের কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম গোবিন্দ ঘাট ও ঘাংরিয়ার ডাকবাংলোতে আশ্রয়ের অনুমতি। হেমকুণ্ড-লোকপাল ও নন্দন-কাননের পথে যেতে এই দুই স্থানে রাত্রিবাস করা দরকার। গোবিন্দঘাট ও ঘাংরিয়াতে শিখদের ধর্মশালাও আছে, তবে বনবিভাগের ডাকবাংলোগুলি ঢের বেশী আরামপ্রদ। কলকাতা থেকেই ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসারকে ঐ স্থানে রাত্রিবাস করবার অনুমতি চেয়ে পত্র দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। পরে শুনেছিলাম, আমার ফিরে যাবার পরে আমার অনুমতিপত্র জোশীমঠে পৌঁচেছিল।

পুরোহিতজীকে নমস্কার জানিয়ে আবার বড় রাস্তায় নেমে অভিযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করা। দুজনে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি ঝাড়কুলার দিকে-- দলকে স্বাগত জানাতে। বেলা দুটো বাজে, জোশীমঠ থেকে মাইল দেড়েক দূরে শেরপাদের সঙ্গে দেখা হল। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললাম আমি, বীরেন রইল বাকী সকলের জন্য।

বেলা প্রায় তিনটার সময় পুরো দলটি সমাগত হলেন, বিড়লা রেস্টহাউসে। রুকস্যাক ঘাড়ে, হেলাঙের পরে দীর্ঘ পাকদণ্ডী ভেঙে সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত। শুনলাম মালবাহীদের দেরীর জন্য ওরা পিপলকুঠী থেকে গতকাল সকালে রওনা

হতে পারেনি। বেলা চারটে নাগাদ রওনা হয়ে বেলাকুচীতে রাত কাটিয়েছে। পথে ধস পার হতে গিয়ে একটা ঘোড়া গভীর খাদে পড়ে মরেছে, একজন কুলিও বিশেষভাবে আহত হয়েছে। ওদের স্নান সেরে আহারাদি করতে বেলা প্রায় পাঁচটা বেজে গেল।

বিকালে আমি একা বের হলাম পথে। বাজারে গিয়ে চা, সিঙ্গাড়া ও মিষ্টি খেলাম। একটু ঘুরে বেড়াতেই দেখা হল দিল্লীর ব্রিগেডিয়ার কর্তার সিংয়ের সঙ্গে। প্রৌঢ় শিখ ভদ্রলোক, সস্ত্রীক হেমকুণ্ড থেকে ফিরছেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরে চললাম বিড়লা রেস্টহাউসে। শুনলাম ওঁরা সবশুদ্ধ ১০৮ জন শিখ তীর্থযাত্রী গিয়েছিলেন হেমকুণ্ডে। এখন সবাই ধীরে ধীরে ফিরছেন। ওদের সঙ্গে ড্রাই রেশন, অর্থাৎ চাল, আটা, ডাল প্রভৃতি ছিল। কর্তার সিংয়ের কাছে শুনলাম গোবিন্দ ঘাট এবং ঘাংরিয়াতে দোকান আছে, খাবার পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া পথে ২।১ জায়গায় আলু সেদ্ধ, চা ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যাবে। আমারও যাত্রাপথ বর্তমানে এখান থেকে সোজা গোবিন্দ-ঘাট হয়ে ঘংরিয়া। অতএব মনোযোগ দিয়ে খবরগুলো সংগ্রহ করে নিলাম। নন্দনকানন ও হেমকুণ্ডের পথ নির্জন ও বসতি বিরল। সাধারণ যাত্রীপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে গোবিন্দঘাট থেকে। কাজেই পথের খবর ভালো করে জেনে রাখা দরকার। আগে ঠিক করেছিলাম সঙ্গে রসদ আটা, আলু প্রভৃতি কিনে নেব জোশীমঠ থেকে। কর্তার সিংয়ের খবরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সেগুলো সঙ্গে নিয়ে বোঝা বাড়াবার চিন্তা পরিত্যাগ করলাম। তাছাড়া একলা মানুষের প্রয়োজনই বা কতটুকু? বাদাম, বিস্কুট, জ্যাম, চিড়া, চা, কফি, চিনি ও গুঁড়াদুধ সঙ্গে আছে।

আজ সন্ধ্যায় বিড়লা হাউস লোক সমাগমে মুখর। দোতলার ও একতলার ঘরগুলি পরিপূর্ণ। কর্তার সিং এবং আরও কয়েকটি শিখ পরিবার আজ এখানে থাকবেন। বাড়ীর ভেতরের প্রশস্ত উঠানে কুলীর দল জটলা করছে। বাইরের বাগানে নীলগিরি অভিযাত্রীদের মালবাহী খচ্চরের দল, বারান্দায় স্তূপাকৃতি মালপত্রের মাঝে শেরপারা। বড় ঘরটা ওদের ছেড়ে দিয়ে আমি পাশের অপেক্ষাকৃত ছোটঘরটাতে আশ্রয় নিয়েছি। আমার ঘরে দলপতি অমূল্য সেন, সহকারী ভানু ব্যানার্জি, চঞ্চল মিত্র ও দলের চিকিৎসক ডাঃ বিমল ঘোষাল আছে। স্থানীয় মালবাহক এবং খচ্চর সংগ্রহ করেছে প্রবীন অভিজ্ঞ শের সিং। আজ রাতে সিংহদ্বারের একটা হোটেল থেকে অভিযাত্রী দলের

খাবার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে শের সিং। আমার খাবারও আনবার জন্য বলেছি একই সঙ্গে। অনেকটা চড়াই ও উৎরাই ভাঙবার হাত থেকে পাদুটো আজ রাতে একটু রেহাই পাবে। এইসব পাহাড়ী পথে সর্বদা পায়ের যত্ন করা প্রয়োজন। অন্য যে কোন অসুখ নিয়ে পথ চলা হয়ত যায়, কিন্তু পা জখম হলেই মুস্কিল।

একটা নড়বড়ে খাটিয়ায় শুয়ে গল্প করতে করতে ঘুম……।

॥ ৭ ॥

গোবিন্দঘাট

ভোর ছটায় ঘুম ভাঙলো অভিযাত্রীদের মেট শের সিংয়ের ডাকে। সে এসেছে এক কেট্‌লী গরম চা নিয়ে। বিছানায় শুয়ে—এই ঠাণ্ডায় এত ভোরে গরম চা—মুল্যবান সম্পদ। ধীরে সুস্থে বাঁধাছাদা সেরে 'তারা'নাম নিয়ে বের হলাম পথে। বেলা আটটা। বাজারে এসে প্রাতরাশ করা গেল—দুধ ও মিষ্টি। কিছু ক্ষীরের লাড্ডু ও বরফী ব্যাগে নিয়ে জোশীমঠ ছাড়লাম আমি আর ঘুর বাহাদুর। দুরাত এখানে কাটানোতে সে বেজার হয়েছে। তার ওপরে গতকাল থেকে নগদ বকশিশ করিনি। তাকে বোঝালাম যে পিপলকুঠী থেকে দু'পাড়াও' অর্থাৎ দুরাতের পথ জোশীমঠ এসেছি একদিনে। সারাদিন পথ চলে রাত্রি-বাসকে এরা বলে 'পাড়াও'। কিন্তু নেপালী দোতিয়াল, সোজা হিসেব বুঝতে চায় না, গজ্‌গজ্‌ করে। তার ওপরে, আমার আগের যাত্রী কলকাতার ডাক্তারবাবু নাকি রোজ ওদের মোটা বকশিশ করতেন। একটু রূঢ়ভাবেই বললাম যে কোন কাজ না করলে শুধু শুধু বকশিশ দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়, এবং জুলুম করলে কিছুই পাবে না। বুঝলাম নিরুপায় যাত্রীদের এইসব দোতিয়াল কিভাবে দোহন করে। মনে মনে ঠিক করলাম, তাদের একজনকে অন্তত উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো যাতে তার ভবিষ্যতের যাত্রীদের আর অসহায় অবস্থায় পড়তে না হয়।

জোশীমঠ শহরের সীমানা ছাড়াতেই পাথরের বাঁধানো পথ শেষ হয়ে গেল। শুরু হল কাঁচা মাটির রাস্তা। আঁকা বাঁকা খাড়া পাহাড়ী উৎরাই। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ভাঙাচোরা। অবিরত পাথর আর মাটির ছোট বড় চাঁই উপরের পাহাড় থেকে, বহু নিচে দিয়ে প্রবাহিত। ধৌলীগঙ্গায় পড়ছে দূরে আশেপাশের

পাহাড় থেকে গুম্ গুম্ আওয়াজ হচ্ছে মাঝে মাঝে—ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙ্গার শব্দ। ধস নামার শব্দ ও ডিনামাইটের আওয়াজের পার্থক্য সামান্যই, শুধু স্থায়ীত্বের কম-বেশী। দু মাইল খাড়া উৎরাই নেমে বিষ্ণুপ্রয়াগ—অলকানন্দা ও ধৌলীগঙ্গার সঙ্গম।

অতি সাবধানে নিচে নামছি। ভাঙ্গা চোরা সরু পায়ে চলা পথ। দেশীয় পথিকরা সাবধান করে দিচ্ছে, "পথ্থর চল্‌তি হ্যায় মহারাজ, কোই সুরত্‌সে জান্ বাচায়কে নীচে পুল পর পঁহুছিয়ে।" মাঝে মাঝে মনে হয় আর বুঝি—পারব না ধস ডিঙ্গোতে। মাঝ পথে একটা চটি পার হয়ে এলাম। সেখানে একটা চায়ের দোকানও আছে। কিন্তু দাঁড়ালাম না। বেলা সওয়া নটায় নিচে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে ধৌলীগঙ্গার সেতু পা' হয়ে মন্দিরের সামনে একটা পাথবের ওপরে বসলাম।

অশান্ত ধৌলীগঙ্গা ভীম গর্জনে ফেনিল কর্দমাক্ত ঘোলা জল নিয়ে অলকানন্দার শান্ত নীল জলে এসে মিশেছে। অনেকক্ষণ আমার আসার পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। যে পথ দিয়ে আমি এতক্ষণ এসেছি। উপর থেকে বড বড পাথরের চাঁই, মাটি ও পাথবের ঢেলা ক্রমাগত ধৌলীর গর্ভে নেমে চলেছে গুড় গুড় আওয়াজ করতে করতে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি ফেরার সময় আবার এই পথ ধরে উপরে উঠতে হবে। একটা ছবি নিলাম। এই বিষ্ণুপ্রয়াগে পুরাকালে নারদ বিষ্ণুব আরাধনা করে সর্বজ্ঞ হয়েছিলেন।

একঘণ্টা অপেক্ষা কবেও আমার কুলির দেখা নেই। বেলা সওয়া দশটায় আবার চলতে শুরু করি। অলকানন্দার পাশ দিয়ে পাথরের দেওয়ালের মত পাহাডের গায়ে স্বল্প পরিসর পায়ে চলা পথ।

বিষ্ণুপ্রয়াগে আলাপ হয়েছে কুমায়ুনের অধিবাসী লোহানীর সঙ্গে। সে জোশীমঠের টেলিফোন অফিসের কর্মচারী। কথা হল সামনের বছর অক্টোবর মাসে পিণ্ডারী হিমবাহ যাবার।

সরু পায়ে চলার পথে অলকানন্দার তীর ধরে এগিয়ে চলেছি। দুধারে নানা রংয়ের খাড়া গ্র্যানাইট পাহাডের দেওয়াল, পাথরের গায়ে ঘাস, বিছুটী বা কাঁটাগাছ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা ছোট ছোট ফুলের গাছ—ফুল ফুটে আছে। রাস্তার ওপর দিয়ে পাথরের ওপব বড় বড গিরগিটি চলে বেডাচ্ছে। দুয়েকটা ছোট ছোট পাখিও দেখতে পাচ্ছি। রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ঝরণা পার হতে গিয়ে জামা কাপড় জুতা মোজা সবই ভিজে গেল। সেগুলোকে

খুলে জল ঝরিয়ে আবার পরে নিয়ে পথ চলি। নির্জন পাহাড়ী পথ। বদরিকাশ্রম ফেরত তীর্থযাত্রীরা দুয়েকজন চলেছেন। মাঝে মাঝে এক আধজন দেশীয় মালবাহী ও ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে পাহাড়ীরা চলেছে। তীর্থ-যাত্রীরা আমায় দেখে বলছেন, 'বদরি বিশাল জী কি জয়' আর দেশীয় লোক বলে 'কিত্‌নী টেইম্‌ (সময়) হ্যায় মহারাজ'? এই পথের ওপরে আর একটা পুরানো পথ ধস নেমে কয়েক বছর হল পরিত্যক্ত হয়েছে। ধীরে ধীরে পথ চলি।

আজ আকাশ একেবারে নির্মল। কিন্তু পাহাড়ে বৃষ্টি আসতেই বা কতক্ষণ। বর্ষাতি, শীতবস্ত্র ও সামান্য সম্বল খাবার সবই রয়েছে কুলির কাছে। আজ তার মেজাজটাও সুবিধা নেই। মনটা তাই একটু বিষণ্ন। রোজই ২৲।২॥০ টাকা বকশিশ চাই। দিতে অস্বীকার করলেই বেজার—তাই বোধহয় আস্তে আস্তে পথ চলছে। বাংলাদেশের লেখকরা এদের সম্বন্ধে কত কি যে ভাল ভাল বিশেষণ দিয়ে লিখেছেন। অথচ আমার বরাতে এমন একটা লোক জুটেছে যে পথে অন্য উপকার দূরে থাকুক, বিছানা করা, নোংরা শোবার জায়গা একটু ঝাঁট দেওয়া এবং সকালে যাত্রার পূর্বে বিছানাপত্র বাঁধা সবই নিজেকে করে নিতে হয়েছে। কোন সাহায্য পাইনি। পথ চলেছি সম্পূর্ণ নিজের উপরে আস্থা রেখে, শুধুই মনের জোরে। সে বরং আমাকে নানা রকম জন্তু জানোয়ারের ভয় দেখিয়েছে, শুনিয়েছে—পথের বাধা। বলেছে—আশ্রয় ও খাদ্যের অভাবের কথা। ওসব কথায় কোন দিনই কর্ণপাত করিনি। মনে হয়েছে সে না জানি কতশত যাত্রীদের নাকাল করেছে, বিশেষতঃ অশক্ত বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোক যাত্রীরা, যাঁরা সঙ্গী কুলীদের ওপরে নির্ভর করেই পথ চলতে বাধ্য হন।

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে প্রায় তিন মাইল চড়াই ও উৎরাই পার হ'য়ে 'ঘাট' চটি। অলকানন্দার ধার দিয়ে পথ। পথের পাশে শস্যক্ষেত্র। শস্যক্ষেত্র না বলে ফুলের বাগান বলাই উচিত। বড় বড় ফুল। অনেকটা মোরগ ঝুটি ফুলের মত। এই ফুলের পাকা বীজ পিষে ছাতু করে তার রুটি হয়—নাম 'রামদানা'। পাহাড়ীরা বলে 'চুয়া' (Amarantus Frumentaceus)। রামদানাই এ অঞ্চলের একমাত্র শস্য। অত্যন্ত পুষ্টিকর। খেলে শরীর গরম রাখে।

কয়েকটা চটি, দোকান ও দুয়েকটা ছোট কুটির নিয়ে এই ঘাট চটি। এখান থেকে গোবিন্দঘাট এক মাইল ও পাণ্ডুকেশ্বর দু মাইল। একটা মাত্র দোকান খোলা আছে। বাকী সব বন্ধ। জন বিরল চটি এখন বন্ধ হবার মুখে। দুজন

সেপাই বসে পুরী ও আলুর তরকারী খাচ্ছে। পকোড়া, জিলাপী, লাড্ডু প্রভৃতি থালায় সাজানো আছে দোকানে। কিন্তু মাছি ভর্তি, ঠাণ্ডা ও বাসী খাবার খেতে প্রবৃত্তি হল না। এক গ্লাস চা নিয়ে বসে একটু বিশ্রাম করি। তাছাড়া ঘুরবাহাদুরের জন্যও অপেক্ষা করতে হবে। দোকানী সাবধান করে দেয়, এত বেলায় আগে কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না। নোংরামীর জন্য তবুও এখানে কিছু খেতে ইচ্ছা করল না। দোকানদারের ইচ্ছাক্রমে তার একটা ছবি তুলে ধীরে ধীরে রওনা হলাম। মাত্র একমাইল দূরে গোবিন্দঘাটে আজ আমার যাত্রার বিরতি। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা।

অলকানন্দার ধার দিয়ে, ছোট ছোট রামদানার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দুজন যাত্রী ফিরছেন বদরিকাশ্রম থেকে. কালীঘাটে বাড়ী—মুখার্জি ও ভট্টাচার্য। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শ্রান্ত ক্লান্ত চেহারা। শুনলাম বদরিকাশ্রমের পথ বৃষ্টির ফলে বড়ই খারাপ হয়েছে। পড়ে গিয়ে ভট্টাচার্য কোমরের আঘাতে কষ্ট পাচ্ছেন। শুনলাম আজ দুপুরে পাণ্ডুকেশ্বর ও গোবিন্দঘাটে কিছুই আহার জোটেনি। বললাম সামনের ঘাট-চটিতে কিছু মিলতে পারে। মুখার্জিকে অনুরোধ করলাম কলকাতায় ফিরে আমার মা ও স্ত্রীকে আমার সংবাদ জানাতে। ফিরে এসে শুনেছিলাম ভদ্রলোক সংবাদ জানিয়েছিলেন।

বেলা পৌনে দুটোয় ভুন্দর ও অলকানন্দার সঙ্গম ছাড়িয়েই চোখে পড়ল নীলরংয়ের গোল গম্বুজ—গোবিন্দঘাটের শিখ গুরুদ্বার। অলকানন্দার সেতুর পাশেই প্রকাণ্ড গুরুদ্বার ও ধর্মশালা। ঐ সেতু পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই পথে ভুন্দর নদীর গতিপথ অবলম্বন করে নন্দনকানন ও হেমকুণ্ডের পথ। অলকানন্দার পাশ দিয়ে বদরিকাশ্রমের পথ চলে গেছে। পথের ধারে একটিমাত্র ছোট্ট দোকান, খোঁজ করে জানলাম খাবার কিছুই নেই। চা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু চিনি নেই। দোকানদারের কাছে শুনলাম, সে লোক পাঠিয়েছে জোশীমঠে চাল, আটা, চিনি প্রভৃতি আনতে, খচ্চরের পিঠে করে, এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমার কুলীরও দেখা নেই। সকাল আটটায় জোশীমঠ ছাড়ার পরেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে মাত্র সাত মাইল পথ, অতি ধীরে চলেও তাকে সঙ্গে রাখতে না পেরে একটু বিপন্ন বোধ করছি। পরনে সুতী পোশাক, ঠাণ্ডা লাগছে। গরম জামা কাপড়, বর্ষাতিও কাছে নেই। অন্ততঃ ব্যাগটা কাছে থাকলেও চিনি বের করে এখান থেকে চা কিনে সঙ্গের চিড়া সহযোগে কিছু ক্ষুধার উপশম করা যেত। দোকান থেকে কয়েক পা

এগিয়ে বদরীনাথের পথের ধারে বন-বিভাগের ডাকবাংলো বা রেস্ট হাউস। বন্ধ রয়েছে, চৌকিদার নেই। আবার ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করব এমন সময় একজন বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোক কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাব? বললাম, হেমকুণ্ডে যাব, আগামীকাল সকালে। তিনি আমাকে নিয়ে এলেন শিখ গুরুদ্বারে। সেখানকার পরিচালকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রায় জোর করেই প্রশস্ত সিমেন্ট বাঁধানো চত্বরে বসিয়ে দিলেন খেতে। সেখানে আরও কয়েকজন শিখ ভদ্রলোক ও মহিলা বসে খাচ্ছিলেন। একজন গাড়োয়ালীও আমার সঙ্গে বসে গেল। পেতলের থালাতে গরম গরম ফুলকা (রুটি), ডাল, আলুর সবজী, ও কয়েক টুকরা শশা দিয়ে পরম পরিতোষ করে আহার সমাধা হল। সকলের দেখাদেখি উঠানের একপ্রান্তে নলের জলে থালা ধুতে এলাম। দুটি সম্ভ্রান্ত শিখ মহিলা বাসন মাজছেন। তাঁরা আমার থালাটা ধুতে চাইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমার এঁটো পরিষ্কার করবেন কেন, আমিতো অশক্ত নই? একজন মহিলা উত্তর দিলেন যে তিনি আমার ভগিনী, তাই তিনি আমার এঁটো থালা ধোবেন। পাশে থেকে একজন ভদ্রলোক বললেন যে শিখ তীর্থযাত্রীরা এই গুরুদ্বারে এসে এঁটো, পরিষ্কার, জুতা সাফ প্রভৃতি নানা রকম কায়িক পরিশ্রমকে মহাপুণ্যের কাজ বিবেচনায় নিজহাতে করে তৃপ্তিলাভ করেন। এই গুরুদ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। রাজা-মহারাজা, রাজ্যপাল ও মন্ত্রী থেকে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত, সব ধর্মের ও সর্ব জাতির লোকের জন্য অবারিত। প্রত্যেককে দুবেলা রুটি, ডাল ও তরকারী এবং চা দেওয়া হয়। এই গুরুদ্বারে থাকবার জায়গা ও রাত্রে শোবার জন্য কম্বল পাওয়া যায়। হিমালয়ের এই দুর্গম জনবিরল স্থানে আহার ও বাসস্থান পাওয়াতে যে কত উপকার হয়, শুধু দুকলম লিখে তা প্রকাশ করা যায় না। হেমকুণ্ড শিখদের তীর্থস্থান, অথচ এখানের এই সদাব্রত সকলের জন্য। শুধু এখানেই নয়, দুর্গমতর ঘাংরিয়া এবং হেমকুণ্ডেও তৈরী করেছেন ধর্মশালা। দুস্তর বরফের রাজ্যে শ্রান্ত অবসন্ন তীর্থযাত্রীর একান্ত নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। ঘাংরিয়া ও হেমকুণ্ডের ধর্মশালাতেও শীঘ্রই খাওয়ার ব্যবস্থা চালু হবে শুনলাম। নমস্কার জানাই ভারতের শিখদের। তাঁরা সেবাধর্মের নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন।

খাওয়া সেরে চৌকিদারের বাড়ীতে গিয়ে জানলাম বৃদ্ধ চৌকিদার অসুস্থ,

তার ছেলে আনন্দ সিং আমার সঙ্গে এসে ডাকবাংলো খুলে দিল। অলকানন্দার গর্ভ থেকে একটু উপরে, বদরিকাশ্রমের পথের ধারে, সুন্দর বাগানে ঘেরা দু-কামরার বাড়ী। ঘরের মেঝেতে দড়ির কার্পেট। আসবাবপত্র এখনও এসে পৌঁছায়নি। স্নানের ঘর ও একটা ছোট কাপড় ছাড়বার ও জিনিসপত্র রাখবার ঘর আছে। স্নানের ঘরে জলের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। বিকেলের অল্প রোদে ভিজে জুতা মোজা শুকাতে দিয়ে বারান্দায় বসে অলকানন্দার শোভা দেখছি। বদরিকাশ্রমের দিকে লক্ষ্য করলে দূরে বরফের শৃঙ্গ চোখে পড়ে। পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সাদা পাহাড়ের চূড়া। আর নিচের দিকে, অর্থাৎ আমার আসবার পথের দিকে চাইলে দেখা যায়, নদীর ওপরে ঝুলানো লোহার সেতু পার হয়ে পাহাড়ের উপরে সঙ্কীর্ণ চড়াই পথ উঠে গেছে হেমকুণ্ড ও নন্দন-কানন অভিমুখে। সে পথের চারিদিকে উন্নত সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, তার মাঝখান দিয়ে ভুন্দর নদীর অবতরনিকা—অপূর্ব সুন্দর!

হাল্‌কা সুতী জামাকাপড় পরে পথ চলতে আরাম, কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থাকলেই শীতবোধ হয়। গোবিন্দঘাট সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচু, প্রায় দার্জিলিঙের সমান। মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্যে, নির্জনতা যাদের প্রিয় তাদের কাছে এই স্থান খুবই আকর্ষণীয় হতে পারে মাত্র এক মাইল দূরেই পাণ্ডুকেশ্বর. বেশ বড় জায়গা, সেখানে দোকান, পুলিস চৌকি, হাসপাতাল, ডাকঘর, ধর্মশালা ইত্যাদি সবই আছে।

ক্রমশঃ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সৈন্য বাহিনীর কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ও শেপাই এসে পাশের ঘরটা দখল করে আহারাদি শুরু করে দিলেন। আলাপ হল। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর এক দলটি টহল দিয়ে ফিরছেন। প্রৌঢ়-সেনাপতি লেঃ কর্নেলের সঙ্গে অনেক কথা হল। বললাম, তাঁরা স্বাধীন মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষার মহাপবিত্র কার্যে রত আছেন। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং পরিপূর্ণ আস্থাবান। আমার একাকী অভিযানের কাহিনীর সামান্য অংশ শুনে তিনি আমায় বললেন সৈন্যদলে যোগ দিতে। সেনানীর কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা জানাতে তিনি বললেন যে আমার মত লোকের নাকি অত্যন্ত প্রয়োজন সৈন্যদলে। আহারাদি সেরে আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন। এঁদের দেখে গর্ব অনুভব করলাম। সৌজন্য-পূর্ণ অথচ নিজ কর্তব্যে রত এই দৃঢ় চরিত্র ভারতীয় জওয়ানদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। ভারতের জয় সুনিশ্চিত।

বারান্দায় বসে আছি আর ভাবছি আমার কুলির কথা, এখনও তার দেখা নেই। ঠাণ্ডাহাওয়ায় বসে থেকে বেশ শীত লাগছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় পুলিস চৌকীর জমাদার চতুর্বেদিজী। আমায় একা বসে থাকতে দেখে কাছে এসে বসলেন। হেলাঙ্গ থেকে জোশীমঠের পথে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি এখানকার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। কুলির কথায় তিনি বললেন যে বর্তমানে সৈন্যবাহিনীর কাজের জন্য কুলীদের দর বেড়েছে এবং সব সময়ে পাওয়াও যায় না।

বেলা চারটের সময় শ্রীমান ঘুরবাহাদুব এসে হাজির হল। স্বর্গ হাতে পেলাম। ব্যাগ থেকে চিনি বার করে নিচের দোকানে এলাম। মগে কবে চা নিয়ে ফিরছি ডাকবাংলোতে, পথে ঝরণার ধারে কয়েকটি পাহাডী মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। পিঠে প্রকাণ্ড ঘাসের বোঝা, পথেব ধারে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ভারী হাসিখুশী—সরলতার প্রতিমূর্তি। আমার হাতে চা দেখে ওরাও চা খেতে চাইলে বললাম আমার সঙ্গে আসতে। একটি মেয়ের ছবি তুলে ওদের চা খেতে পয়সা দিলাম। পরমানন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল ওরা। বড়ই গরীব এই পাহাড অঞ্চলেব অধিবাসীরা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চৌকীদার গেছে পাণ্ডুকেশ্বরে আটা ও ঘি আনতে, আজ রাতে আমি তার অতিথি। ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে, গবম জামা কাপড পরে বসে ডায়েরী লিখছি। শিখ ধর্মশালা থেকে আমার জন্য চা এল। আমি কোথায় আছি খবর নিয়ে ওরা এখানে চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবাব ওঁদের এই অযাচিত সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।

আমার মালবাহক কিছু অগ্রিম টাকা নিয়ে পাণ্ডুকেশ্বরে রাত কাটাতে চলে গেল। একটু পরেই বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়, মেঘ গর্জন ও বিদ্যুতের চমক সঙ্গে নিয়ে। বাইবে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দরজা জানালা বন্ধ করে গবম চাদর গায়ে জড়িয়ে বিছানায় বসে মোমবাতির আলোয় ডায়েরী লিখছি। চৌকিদারের ডাক শুনে লেখা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে দেখি কখন বৃষ্টি থেমে গেছে। নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ তারায় ঝলমল করছে! আকাশের গায়ে ছাইরংয়ের বরফের চূড়া, নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। খাবার প্রস্তুত করে এনেছে আনন্দ সিং—পুরী ও আলুর তরকারী। আমায় খেতে দিয়ে পাশে বসে গল্প করে। আনন্দ সিং সৈন্য বিভাগে মোটর গাড়ীর চালক। এখন ছুটিতে দেশে এসেছে।

আবার তাকে ফিরে যেতে হবে সুদূর আসামে। জীবনে এই প্রথম সে একজন ভ্রমণকারীকে রান্না করে খাওয়াল। আমাকে নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে। একটু অবাকও হয়েছে সে আমার এই নিঃসঙ্গ ভ্রমণে।

পরিতোষ করে আহার সেরে ওকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে শোবার আয়োজন করি। একা এই নির্জন ডাকবাংলোতে ভারী ভাল লাগছে। গভীর গর্জন করে অলকানন্দা বয়ে চলেছে ডাকবাংলোর নিচে দিয়ে। ঐ একটানা গর্জনে না জানি কত কথা—দেবলোকের বাণী শোনাতে চেষ্টা করছে মর্তবাসীদের—যুগ যুগান্ত ধরে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিংসঙ্গ ও বাইরের কোলাহল থেকে মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন না হলে তো নদীর ভাষা বোঝা যাবে না। হিন্দু শাস্ত্রকারদের বর্ণনায় বনদেবী, জলদেবতা, পাহাড ও অরণ্যের দেবতা ও মহাত্মাদের কথা এই সব স্থানে ঘুরলে মোটেই অলীক বলে মনে হয় না। এমন কি পাশ্চাত্যদেশের মনীষীরাও বলেন যে ওদেরও ভাষা আছে। পৃথিবী বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ লিখেছেন, 'The brooks, the forests, the mountains are great chatterers, but they will speak to you only when you are alone.'

॥ ৮ ॥

ঘাংরিয়া

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গে পাখীর গানে। সুন্দর শীশ দিয়ে গান গাইছে ছোট ছোট পাখী, অনেকটা বুলবুলির মত দেখতে। আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর।

পদচারণা করতে করতে ডাকবাংলোর বাগানের পাশ দিয়ে নেমে আসি নদীর ধারে। একটা প্রকাণ্ড পাথরের ওপরে বসে বসে নদীর শোভা দেখি।

আনন্দ সিংয়ের দেওয়া এক বালতি গরম জলে আরামে স্নান সেরে নিলাম। ব্যাগ থেকে সবগ্লাম বের করে চা. বাদাম ও মিষ্টি খেয়ে নিয়ে প্রস্তুত হলাম দীর্ঘ কষ্টকর পদযাত্রার জন্য। স্যুটকেশটা রইল আনন্দ সিংয়ের জিম্মায়। দুস্তর চড়াইয়ের পথে আরও হাল্কা করে নিলাম আমার মালপত্র। আনন্দ সিং দু সের আটা সঙ্গে দিল, যদি পথে কিছু না পাওয়া যায়। দু-রাত কাটাতে হবে। বেলা ৮।২০ মিনিটে গোবিন্দঘাট ত্যাগ করে এবার ঘাংরিয়ার পথে বেরিয়ে পড়লাম।

অলকানন্দার ঝোলানো লোহার সেতু পার হয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দুস্তর চড়াই। কখনও কখনও ৭০°/৮০° ডিগ্রী খাড়াই। ভুন্দর গঙ্গার তীর দিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই ভাঙ্গছি। বৃক্ষবহুল উন্নত সবুজ পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে নেমে আসছে ভুন্দর গঙ্গা,—নৃত্যময়ী প্রাণ-চঞ্চলা কলহাস্যে মুখরিতা যৌবনগঙ্গা। দূরে উত্তুঙ্গ বরফাবৃত শৃঙ্গ—হাতী ও গৌরী পর্বত।

ঘাসবন কাঁটাগাছ ও বিছুটীর বন পেরিয়ে চলেছি হাঁফাতে হাঁফাতে। পাহাড়ের আড়ালে গোবিন্দ ঘাট অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটু করে উঠি, দাঁড়িয়ে দম নেই। কখনও কাঁধের বোতল থেকে জল খাই, কখনও পকেট থেকে লজেন্স বের করে মুখে পুরি। এই সব পাহাড়ী পথে হাঁটতে হলে পিপারমেন্ট লজেন্স বিশেষ প্রয়োজনীয়, পিপাসা মেটায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। বাব্‌লার মত জংলা গাছ, ঘাস আর কাঁটাবনের মাঝ দিয়ে পাথর মেশানো কাঁচা মাটির পথ। মাঝে মাঝে ভাঙ্গা। এঁকে-বেঁকে ক্রমেই উঁচুতে উঠ্‌ছে পথ। ধীর গতিতে এমনি পথে চলে মাইল দেড়েক দূরে একটা গ্রামে এসে পড়লাম। কেউ বলে 'পুন্‌লা গাঁও', কেউবা বলে 'পুন্‌ গাঁও'। ছোট একটি উপত্যাকা। চারিদিকে লাল রংয়ের রামদানার ক্ষেত। পাহাড়ের গা থেকে শুরু হয়ে নদীর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তারই মাঝে কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ী। রঙ্গীন সুন্দর ছবির মতো গ্রামখানি। মেয়েরা রামদানার শীশগুলো কাট্‌ছে, কেউবা গরু মোষের পাল নিয়ে পাহাড়ে চরাতে চলেছে। শুনেছি এখানে একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী সাধু থাকেন, নাম স্বামী অরূপকৃষ্ণ তীর্থ।

পুন্‌লা গাঁয়ে না থেমে, আরও একটু উপরে এসে একটা ঝরণার পাশে ছোট্ট একটা চায়ের দোকানের সামনে রাখা কাঠের বেঞ্চে বসলাম। বুড়ো দোকানদার এক গেলাস চা ও কিছু আলুর দম খেতে দিল। সঙ্গী কুলীকেও কিনে দিলাম। দোকানদার বলল—যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। আজই সে দোকান বন্ধ করে নিচে নেমে যাচ্ছে। তাকে বলে দিলাম যে আগামীকাল নীলগিরি অভিযাত্রীদের একটা বড় দল এপথ দিয়ে যাবে। দোকান খোলা রাখলে তার কিছু রোজগার হবে। পরে বীরেনের কাছে শুনেছিলাম যে আমার এই উপদেশে দু পক্ষেরই বিশেষ উপকার হয়েছিল। অভিযাত্রীরা কিছু খেতে পেয়েছিল। এই সব দুর্গম জনমানবশূন্য অঞ্চলে আহার ও বাসস্থান পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

মিনিট পনেরো বিশ্রাম করে আবার রওনা হলাম বেলা সওয়া দশটায়।

সেই চড়াই পথ, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে রুইস্, ভূর্জপত্র আর নাম-না-জানা বড় বড গাছ। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়ার পথ শুধুই উপরের দিকে উঠে গেছে। সাত মাইল এই পথে উপরে উঠতে হবে চার হাজার ফিটেরও বেশী। তবে পথে দু এক জায়গায় সামান্য উৎরাইও আছে। অতি ধীরে পথ চলি, একটু দাঁড়াই, এক ঢোক জল খাই, আবার চলি।

আজ আর কুলিটাকে কাছ ছাড়া হতে দিই না, সে বিদ্রূপ করে বলে, 'ডর কেয়া ?' উত্তর দেই, 'কোই আদ্‌মী', ইয়া জানোয়ারসে ডর নেহি হ্যায়, লেকিন মেরে সামান্ সাথ্‌মে লেকর চলুঙ্গা।' গতকাল ওকে সঙ্গে না রেখে অনেক কষ্ট পেয়েছি, সেই ভুল আর করতে চাই না। গজ গজ করতে করতে সে পথ চলে।

বেলা প্রায় একটায় গোবিন্দঘাট থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে ভুন্দর গ্রামে এসে পৌঁছানো গেল। একটি মনোরম ছোট্ট উপত্যকা। পাশ দিয়ে ভুন্দর নদী বয়ে চলেছে। চারিদিকে উঁচু পাহাডগুলির মাথার ওপর দিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে হাতি ও গৌরী পর্বত। স্থানীয় গ্রামবাসীরা গৌরী পর্বতকে বলে ঘোড়ী পর্বত। ক্রমে মহাভারতোক্ত নামগুলোর বিকৃতি ঘটেছে।

পাহাড়ের আনাচে কানাচে স্তরে স্তরে ছোট ছোট রামদানার ক্ষেত। গ্রামে মাত্র কয়েকটি বাড়ী গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁডিয়ে আছে। একটা কাঠের দোতলা বাডীতে পঞ্চায়েত-কোঠী। নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এই পাহাড়ীদেব জীবনযাত্রা। দারিদ্র্যই মনে হয তার প্রধান কারণ। সঙ্গে রয়েছে যুগান্তব্যাপী অশিক্ষার অন্ধকার। সম্প্রতি সরকার এ বিষযে অবহিত হয়েছেন। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, স্কুল ও ঔষধালয় প্রভৃতি করা হয়েছে অনেক স্থানে। তবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়তে হলে, আরও সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে হবে এবং দেশের সবত্র জনসংযোগের প্রথম কাজই হবে ভাল রাস্তা ঘাট নির্মাণ। তবে এটাও ঠিক যে শিক্ষার আলোক যতই আসবে, ততই এদের সরলতা ও প্রাচীন বৈশিষ্ট অন্তর্হিত হতে থাকবে।

ভুন্দর গ্রামের একমাত্র ছোট দোকানটিও বন্ধ। ঘুরবাহাদুরকে রুটি বানাতে বললাম। সে অস্বীকার করল, অতএব আবার চলা। ভুন্দর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে ঘাংরিয়াতে গিয়ে আজকের মত বিশ্রাম। কিন্তু পথ আর ফুরায় না। শুধুই চড়াই। জঙ্গলের ধার দিয়ে, ঝরণার ওপর দিয়ে বড় বড় পাথরের

চাঁইগুলো ডিঙ্গিয়ে। শরীর ক্রমশঃ একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, পথে একজন সাথী মিলেছে। ঘাংরিয়াতে তার একটা দোকান আছে। শুনেছে শীঘ্র একটা বড দল এ পথে আসছে, তাই সে কিছু উপার্জনের আশায় চলেছে দোকানটা চালু করতে। পথের ধারে একটা বড পাথবের ওপরে অবসন্ন হয়ে বসে পড়েছি। বললাম, 'আর পারব না, এখন এখানেই শোব'। দোকানদার উৎসাহ দেয়, 'আর মাত্র কয়েক ফার্লং পথ অবশিষ্ট আছে, সন্ধ্যার আগে সেখানে না পৌছাতে পারলে বিপদ হবে। হিংস্র শাপদ সঙ্কুল এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে পথ যাবে হারিয়ে।' বুঝি সবই, কিন্তু শরীর যে বিদ্রোহ করছে। বেচারা শরীর সমতলের জীবনে অভ্যস্ত। আমার দুর্নিবার শখের ঠ্যালায় এই বিপথে এসে এখন আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। পথের ধারে বসে ধুঁকছি এমনি সময় দেখি লোকজন ও ঘোডা নিয়ে ঘাংরিয়া থেকে নামছেন পূর্ত বিভাগের এঞ্জিনিয়ার। কিছু কথাবার্তা হল। বললেন, অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য নন্দন-কাননে ফুল আর অবশিষ্ট নেই। তাছাডা ভেডা ও ছাগল চরানোর জন্য সেখানে বর্তমানে ফুল বেশী পাওয়া যায় না।

ভুন্দরের জঙ্গল থেকে রুইস্ গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়েছিলাম, লাঠি হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য। অনেকটা আমাদের দেশের করবী গাছের মত, আরও বড ও অনেক মোটা হয় ডালগুলো। প্রায় গোডা থেকেই সবল ও দীঘ। এই ডালগুলো অত্যন্ত শক্ত এবং সহসা ভাঙ্গে না। এ গাছের কচি ডালে ভাল দাঁতনও হয়। রুইস গাছের ডালের লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে ক্রমশঃ ঘাংরিয়ার গভীর জঙ্গলে ঢুকলাম। বড বড প্রাচীন গাছের মধ্যে দিয়ে ঘনান্ধকার ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির কাঁচা রাস্তা। বড বড পাথর পডে আছে। চলতে বেশ কষ্ট হয়। দশ হাজার ফুট উঁচুতে হিমালয়ের গভীরে এই আদিম অরণ্যে বিশাল মহীরুহগুলো ঝাউ (Himalayan Silver Fur), পাইন, চৌড (Spruce, Maple, Cedar) শ্রেণীর। গাছের গাভর্তি শেওলা, বড় বড ঝুরি নেমেছে মনে হচ্ছে যেন ধ্যানমগ্ন অতিবৃদ্ধ তপস্বীদের জটা ও দাঁডি গোঁফ।

ঘন জঙ্গলাকীর্ণ আঁকা বাঁকা পথে আরও কিছুক্ষণ চডাই পেরিয়ে স্বল্প পরিসর খোলা জায়গায় পৌছলাম। এখানেই বনবিভাগের রেস্ট হাউস। অবসন্ন দেহটাকে কোনও ক্রমে টেনে তুললাম ঘরের বারান্দায়, বেলা তিনটা বাজে। নির্মল আকাশে বিকেলের রোদ, কিন্তু এই প্রায়ান্ধকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে মনে হয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

চৌকিদার বচন সিং আমাকে সাদরে নিয়ে এল ভেতরে। ঘরের মধ্যে ঢুকেই নজরে পড়ল, টেবিলের উপরে একটা পিতলের ঘটির মুখে বসানো দুটি 'ব্রহ্মকমল'—বরফের মধ্যে জন্মানো হিমালয়ে অত্যাশ্চর্য শ্বেত-পদ্ম।

কোথায় গেল শরীরের গ্লানি, অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসন্নতা। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে ফুল দুটিকে সযত্নে হাতে তুলে নিয়ে ব্যাগ থেকে পলিথিনের প্যাকেট বের করে, তার মধ্যে সঞ্চয় করি এই মহামূল্য সম্পদ আমার এই ছেলেমানুষী কাণ্ড এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল বচন সিং। হয়ত বা বেশ উপভোগ করছিল। এবার হেসে ফেলে সে। বলে 'সাহেব আপ্‌কো ঢের মিলেগা উও ফুল, ঘাবড়াতা কিঁউ?' কি বলে তাকে বোঝাবো, আমার কতদিনের আশা আজ সার্থক হয়েছে। প্রথম দর্শনের যে আবেগ, যে অনুভূতি আমায় আত্মহারা করে দিয়েছে, তার প্রকাশ অন্যের চোখে হয়ত মনে হবে নিছক পাগলামী।

ক্রমে প্রকৃতিস্থ হযে বচন সিংকে জল দিতে বললাম। বাইরের উঠানে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে ঘুববাহাদুব এক কেট্‌লী জল গরম করে দিল। চৌকিদার একটা আপেল খেতে দিয়ে জঙ্গলের ঝরণা থেকে জল এনে আমার পিপাসা মেটায়। তারপরে সে চলে যায় দোকানে, আমার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে। দিনের আলো থাকতেই সে ফিরে যাবে গ্রামের বাড়ীতে। জন্তু, জানোয়ারের ভয়ে অন্ধকারে তারা জঙ্গলের পথে চলে না।

চা খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করি। অত্যন্ত ঠাণ্ডা এই ঘাংরিয়ার জঙ্গল। গরম জামাকাপড় পরে নিয়ে নির্জন শিখ ধর্মশালার পাশ দিয়ে, জঙ্গলের প্রান্তে ছোট একটা কাঠের ঘরে সদ্য খোলা দোকানে এসে বসলাম। বচন সিংও সেখানে বসে ছিল। পথে এই আলাপী দোকানদারের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। সে যত্ন করে ডালডায় একপোয়া পরোটা ও আলুর তরকারী তৈরী করে দিল। শুনলাম ঘিও পাওয়া যেতে পারে তবে বেশী দাম লাগবে। আগামী কাল ঘিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে দিলাম। হিমালয়ের এই গহন অরণ্যের মধ্যেও ডালডার প্রচলন দেখে অবাক হলাম। রাতের আহার সমাপ্ত হল বেলা পৌনে পাঁচটায়। খেতে খেতে আলাপ হল প্রৌঢ় নন্দা সিং চৌহানের সঙ্গে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্ম-কর্তা সপ্রতিভ এই নন্দা সিং। ১৯৩১ এবং ১৯৩৭ সালে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের 'কামেট ও নীলগিরি' অভিযানের সাথী।

নন্দাসিং শ্রীমতী লেগীর সঙ্গেও ছিলেন। লণ্ডনের বোটানিক্যাল গার্ডেনের

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জোয়ান মার্গারেট লেগী ১৯৩৯ সালে নন্দনকাননে এসে বাস করছিলেন কিছুকাল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। নন্দাসিং এ অঞ্চলের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রয়োজন হলে তার সাহায্যে স্থানীয় কুলিও সংগ্রহ করা যায়। নীলগিরি অভিযাত্রীদের কাছে নন্দাসিংয়ের নাম ও ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম, কুলির অভাবে ওদের অহেতুক দেরী হচ্ছিল। আমার এই ভ্রমণ পথে, যেখানে যতটুকু পেরেছি সাধ্যমত সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি আমার বাংলাদেশের এই অভিযাত্রী দলটির। বারবার ওদের বলেছি যে, সারা দেশ ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের ওপরে বাংলার সম্মান নির্ভর করছে। পরে যখন শুনেছি যে সার্থক হয়েছে ওদের অভিযান, তখন আমিও ওদের জয়ে গৌরবান্বিত বোধ করেছি। বাঙ্গলা থেকে অত দূরে নিজের দেশের কয়টি ছেলেকে কাছে পেয়ে যে কি আনন্দ উপভোগ করেছি, তা বর্ণনাতীত। মাত্র তিনটি রাত আমি ওদের সঙ্গে কাটিযেছি, নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। আমার নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করেছে ওরা, আনন্দও দিয়েছে প্রচুর অল্প সময়ের সঙ্গদানে। শেষ বিদায়ের বেলা সহোদরাধিক স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরেছি ওদের। আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছি—বিজয় গৌরবে ওরা ঘরে ফিরুক, সকলের মুখ উজ্জ্বল হক।

রাতের খাওযা সেরে ডাকবাংলোতে ফেরার পথে শিখ ধর্মশালার গ্রন্থির সঙ্গে আলাপ হল। শুনলাম আর মাত্র দুযেক দিনের মধ্যেই হেমকুণ্ডের যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে এবছরের মত এবং সেই সঙ্গে ধর্মশালায় পড়বে তালা। ডাকবাংলোতে ফিরে আসার পরে আমার ঘরে ভাল করে আগুন তৈরী করে দিয়ে বচন সিং আর ঘুরবাহাদুর বিদায় নিল রাতের মত। গন্‌গনে আগুনে জল গরম করে আধমগ কড়া কফি তৈরী করে নিয়ে ডায়েরী লিখতে বসি। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। যাবার সময় চৌকিদার আবার সাবধান করে দিয়েছে, রাতে যেন ঘরের বাইরে না যাই। এখানে স্নানের ঘরে জলের ব্যবস্থা নেই, নিত্যকৃত্য সারতে হয় পাশের জঙ্গলে। কিন্তু রাতের জন্য ঘরেই ব্যবস্থা করে দেয় বচন সিং। বলেছে যে কাল সকালে সব পরিষ্কার করা যাবে। রাতে এখানে ভালুক ও বাঘের ভয় আছে। আমায় নিতান্ত নিরস্ত্র ও নিঃসঙ্গ দেখে তার চিন্তার অন্ত নেই।

হিমালয়ের এই সব অঞ্চলে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু জানোয়ারের অত্যাচারের কথা আমি আগেই শুনেছি। মাংসাশী বাঘের কাছে আমি অতি

নিরাপদ ও সুস্বাদু আহার কারণ আমার সিং নেই ও নখ দাঁত প্রভৃতি সহজাত অস্ত্রশস্ত্রগুলি নেহাতই দুর্বল। ভালুক আসলে নিরামিষাশী হলেও অত্যন্ত হিংস্র। কাজেই তার শুভাগমন হলে সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়া অথবা পৈতৃক প্রাণটা যাওয়াও কিছুই বিচিত্র নয়।

মহাকবি কালিদাস তাঁর একাধিক রচনায় হিমালয় প্রসঙ্গে হাতি ও সিংহের উল্লেখ করেছেন। অনেকে বাঘের কথাও বলেছেন। তবে ভালুকই হিমালয়ের রাজা। ১৮৩৮ সালে লেঃ জর্জ ফ্রান্সিস হোয়াইট (31st Regiment) নামে একজন ইংরেজ সেনাপতি তাঁর 'Views in India chiefly in the Himalaya Mountains', বইতে লিখে গেছেন, 'the great potentate of the Himalyan Forests and fastnesses is the bear. This monster attains a great size and would be very formidable were he as bold as he is savage. The usual colour is black, but specimens found in some parts of the country of a much lighter colour, and in the alpine districts a pure white.'

হিমালয়ের ভালুক নানা রংয়ের ও নানা জাতের। কাশ্মীরের ভালুক প্রকাণ্ড আকৃতির এবং তার চামড়াও মহার্ঘ্য। ফিকে রংয়ের 'Ursus Arctors Isabellinus' ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভালুকও অনেক অঞ্চলেই দেখা যায়। একেবারে সাদা ভালুক, (Snow Bear), বরফের কাছাকছি বা ওপরে থাকে। লাল, হলদে, এমন কি নীল রংয়ের ভালুকও আছে। সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও পর্বতারোহী শ্রীডেসমণ্ড ডয়েল (Statesman) ভুটানের একটি মঠ থেকে একখানি চামড়া সংগ্রহ করেছেন। সেখানকার লোকেরা বলে মানুষের, কিন্তু আসলে সেটা সোনালী রংয়ের ভালুকের চামড়া। মাঝারি সাইজের হলেও হয়ত কোন দিন এই চামড়াখানি পৃথিবীর সব চাইতে মূল্যবান 'ফার' বলে গণ্য হবে। এটি এখন প্রভূত টাকায় বীমা করে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। এর রংয়ের বৈশিষ্ট এই যে এক আলোতে ওটা সোনার মত রং আবার অন্য আলোতে নীল, যেমন কাশানের (Kashan) কার্পেট।

ঘাংরিয়ার এই জঙ্গলে ইয়েতিও নিশ্চয়ই কষ্ট কল্পনা নয়। কারণ মেনলুঙ্ হিমবাহতে (Menlung glacier) ইয়েতির (Yeti—the abominable Snowman) পদচিহ্নের ফটোগ্রাফ শিপটন এবং মিচেল ওয়ার্ড যখন পৃথিবীর

সামনে তুলে ধরেন তখন মহা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সত্য কিন্তু পরে এ্যাড্‌মিরাল শ্লেডের (Admiral Slade) কন্যা ম্যাডেলীন শ্লেড (শ্রদ্ধেয়া মীরা বেন, যিনি মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যা ছিলেন), ইয়েতির সম্বন্ধে বলেন, যখন তিনি ঋষিকেশের পাহাড়ের ভেতরে পিজরাপোল পরিচালনা করেন, গ্রামবাসীদের কাছে ইয়েতির কথা অনেক শুনেছেন। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথাও বলেছেন। টিহ্‌রী গাড়োয়ালে চার হাজার থেকে সাত হাজার ফুটের মধ্যে এদের আনা-গোনা। টিহ্‌রী থেকে ত্রিশ মাইলের ভেতরে ভীলাঙ্গনা (ভীল গঙ্গা) নদীর কাছে একজন গ্রামবাসী একটি ইয়েতি দেখেছে।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা বেজেছে। তিনটা মোমবাতি শেষ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাতের আঙ্গুল জমে যেতে চাইছে। আর লেখা চলে না। চুল্লীর আগুন কখন নিভে গেছে। কাঠগুলো নেড়ে চেড়ে দিই নি, তাই আগুন নিভে গেছে। শরীরের যা অবস্থা, আবার আগুন তৈরীর হাঙ্গামা পোষাবে না, অতএব এবারে শোবার উদ্যোগ করি। পরনে প্রচুর শীতবস্ত্র রয়েছে। ফ্লানেলের অন্তর্বাস, তার ওপরে সুতীব শার্ট, পাজামা, গরম স্লিপওভাব, পুলোভার, মাফলার, মাথায় ব্যালাক্লাভা টুপি, পায়ে নাইলনের ও পশমেব মোজা। তবু যেন শীত মানতে চায় না। শীতের সঙ্গে রয়েছে জ্বরভাব। একটা Pentid Sulphus খেয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে, বাইরের দরজার ছিট্‌কিনী ভাঙ্গা, ভেতর থেকে বন্ধ কবা যায় না। একখানা চেয়ার দিয়ে চেপে দেই যাতে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে না ঢুকতে পারে। কিন্তু ভালুক কিম্বা অন্য বন্যজন্তু? আশা করা যাক আজ রাতে আমার সঙ্গে অহেতুক শত্রুতা না করবার মত শুভবুদ্ধির উদয় হবে তাদের।

কম্বলের তলায় গুটিশুটি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। এই বনময় ডাকবাংলোতে আজ আমি একা।' বাইরে ঝাউবনের শন্‌ শন্‌ শব্দ আর দূরে ভুন্দর নদীর একটানা গর্জন···শুনতে শুনতে একসময় ঘুম নেমে আসে আমার ক্লান্ত চোখে।

॥ ৯ ॥

লোকপাল-হেমকুণ্ড

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। ভালুকের ভয়ে নয়, শীতের জন্যই ঘুমোতে পারি নি। তাছাড়া একটু জ্বরও এসেছিল, টনসিলটাও ফুলেছে। সকাল

সাড়ে ছয়টায় ঘুরবাহাদুর এসে আগুন জ্বালায়। গরম জল হলে, মুখহাত ধুয়ে, চা তৈরী করি। চায়ের বাসনপত্র, গেলাস ও অন্যান্য বাসনপত্র দিয়েছে চৌকিদার, ডাকবাংলোর সম্পত্তি। সঙ্গের বিস্কুটের টিনটা কেটে বিস্কুট, জ্যাম, কাজুবাদাম ও চা দিয়ে প্রাতরাশ সমাধা করে দুজনে বেরিয়ে পড়ি হেমকুণ্ডের পথে। একটা রেক্সিনের ব্যাগে ক্যামেরা, জলের বোতল নিয়ে লাঠি হাতে পথ চলি। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আজ ১লা অক্টোবর। জঙ্গল পার হ'য়ে এক ফার্লং ফাঁকা জায়গা। একটা বড় ঝরণার ধার পর্যন্ত এবড়ো খেবড়ো পাথর মেশানো কাঁচামাটির রাস্তা। ঝরণা পার হয়ে, পায়ে চলার পথটি দুভাগ হয়ে গেছে। বাঁদিকে নন্দনকাননের, আর ডানদিকে হেমকুণ্ডের পথ। ঝরণার জল আসছে হেমকুণ্ড থেকে, স্থানীয় নাম লক্ষ্মণগঙ্গা। ঝরণার উপরে দুটো বড় গাছের গুঁড়ি ফেলা। তারই উপর দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা। আমরা ঝরণা পার হয়ে ডানদিকের পাহাড়ে চড়তে শুরু করি। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি কঠিন চড়াই। একটিমাত্র পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে এঁকে বেঁকে। এই পায়ে চলার পথের দূরত্ব মাত্র সাড়ে তিন মাইল, কিন্তু চড়তে হবে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট।

অতি ধীর, মন্থর গতি, শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ে—

'শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা।
শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনে॥'

অর্থাৎ দীর্ঘ পথ চলতে হলে আস্তে চলো, কাঁথা সেলাই ধীরে করো এবং পাহাড় ডিঙ্গানোর সময়ে অতি ধীরে চলবে। তাড়াতাড়ি করতে গেলেই অকৃতকার্য হবার বিশেষ সম্ভাবনা।

আকাশ পরিষ্কার, বেশ রোদ উঠেছে। ভূর্জপত্র বনের মধ্য দিয়ে পথ। এঁকে বেঁকে উপরে উঠ্ছে। পিছল আলগা পাথর বিছানো পথ, অতি সাবধানে পা ফেলছি। জঙ্গলের মধ্যে খুব ছোট ছোট গাছের মাথায় কয়েক রকমের সূর্যমুখীজাতীয় ফুল। ঘাসের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়। মাঝে মাঝে দেখি ৩।৪ হাত উঁচু রডোডেনড্রন ফুলের গাছে অবশিষ্ট কিছু ফুল এখনও ফুটে আছে। ফুলের মরসুম শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলে এবার অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। শীত আগতপ্রায়। বরফ পড়তে শুরু হয়েছে। ফলে, ফুল গেছে ঝ'রে।

পথের পাশে পাথরের গায়ে দূরত্বের হিসাব লেখা দেখে বুঝলাম প্রথম মাইল

উঠতে সময় লেগেছে পৌনে দু ঘণ্টা। চড়াই ভাঙতে শরীর গরম হওয়ায় অনেক আগেই হাতের দস্তানা, মাথার টুপি, গায়ের কোট ও গলাবন্ধ খুলে ফেলেছি। একদমে না থেমে ২০।২৫ পা চলি, তারপরে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টানি জোরে, জল খাই অথবা মুখে লজেন্স পুরি, আবার এগিয়ে চলি। এখন গায়ে আর জ্বর নেই, তবে শরীরটা একটু দুর্বল। আজ সকালেও কড়া ওষুধ খেতে হয়েছে, যাতে আবার না জ্বর আসে। তার ওপরে এই দুস্তর চড়াই।

যতই উপরে চড়ি, গাছপালা ক্রমশঃ কমতে শুরু করে এবং খর্বকায় হতে থাকে, ক্রমে বিরলও হয়। রোদের জ্বালায় মুখ পুড়ছে, ব্যালাক্লাভাটা গান্ধী-টুপির মতো পরে নেই। চড়াই ভাঙতে দম ফুরিয়ে আসছে। যেন বুকের মধ্যে একটা ইঞ্জিন চলছে পুরোদমে। আর সেই সঙ্গে ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়া টন্‌টন্ করছে। অতি ধীর গতি। আজ আমি হুঁসিয়ার পর্বতারোহী। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না। অতি ধীরে চলে শরীরের শক্তি বজায় রাখতে হবে। তবে আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে রওনা হওয়া উচিত ছিল। বেলা বাড়লে, প্রখর রোদের তেজে চলতে কষ্ট হয়। তাছাড়া রোদের তাপে বরফের গা থেকে মেঘগুলো উপরে উঠে বৃষ্টি নামে আর তার সঙ্গেই শুরু হয় তুষারপাত। তাই পাহাড়ে, বিশেষত বরফের কাছে, বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। প্রবল হাওয়া, বৃষ্টি ও বরফ পড়া সাধারণত অপরাহ্নের দিকেই শুরু হয়। তবে ঘাংরিয়ার ঠাণ্ডায়, শত চেষ্টা করেও বেলা সাড়ে আটটার আগে কিছুতেই প্রস্তুত হয়ে বেরুতে পারি নি।

মাইল দেড়েক ওঠবার পরে বড় গাছ একেবারে শেষ হয়ে গেল। শুরু হল মৌসুমী ফুলের বন। অনেকটা জায়গা জুড়ে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ফুল গাছ। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে ফুলের পাঁপড়ি সবই প্রায় ঝরে গেছে। পাহাড়ের স্থানে স্থানে উঁচু কাঠের দণ্ড পোঁতা আছে, মাথায় কাপড় জড়ানো। কোন পথ দিয়ে উঠতে হবে, তারই নিশানা। মাত্র কয়েক বছর হল শিখেদের চেষ্টায় এই সামান্য আলগা পাথর বিছানো পথটি তৈরী হয়েছে। তার আগে শুধুমাত্র পতাকাচিহ্ন দেখেই কোনওক্রমে পাহাড়ের গা বেয়ে, এঁকে বেঁকে এই বুকভাঙা কঠিন চড়াই বেয়ে উঠতে হত। শিখদের চেষ্টায় যেটুকু হয়েছে, তাতে অন্ততঃ পথ হারাবার বা অনর্থক ঘোরার ভয় আর নেই। যে পাহাড়টায় চড়ছি, তারই মাথায় চিরতুষারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে হেমকুণ্ডে, সপ্তশৃঙ্গ পর্বতের কোলের মধ্যে। পৌঁছাতে হবে, শ্বেত প্রস্তরের সিং দরজার

মধ্যে শ্বেত পাথরে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে।

ক্রমশ চড়াই আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে, শরীরের অবসন্নতা বাড়ে। মনে হয়, কি উৎকট শখের ঠ্যালায় এই শাস্তি! ক্রমে ফুলের বন পেরিয়ে আরও উপরে উঠি। এবারে রুক্ষ পাহাড়ের নগ্ন পাথরের খাঁজে খাঁজে শেকড়ের মত অল্প ঘাস এবং কোথাও কোথাও দুয়েকটা করে ব্রহ্মকমলের গাছ দেখা যায়। শিখ তীর্থযাত্রীদের কৃপায় ফুল আর বেশী অবশিষ্ট নেই। মাত্র কয়েক দিন হল বহু যাত্রী এখানে এসেছিলেন। মধ্য হিমালয়ের চিরতুষারের রাজ্যে রুক্ষ পাথরের খাঁজে জন্মায় এই ব্রহ্মকমল। অত্যাশ্চর্য ও অপার্থিব ফুল। বড় বড় শ্বেত পদ্মের মত এই ফুল আপন ইচ্ছায় পর্বতের অতি উচ্চ স্থানে, চৌদ্দ হাজার থেকে বিশ হাজার ফুটে শুধুমাত্র বরফের মধ্যে জন্মায়। খর্বকায় ক্যানা গাছের মত ছোট্ট গাছে একটি মাত্র ফুল ফোটে, তীব্র সুমিষ্ট গন্ধ, শ্বেত পাপড়িগুলি অতিশয় মসৃণ ও কোমল। ইংরাজিতে এই ফুলের নাম Saussurea (সাউসুরিয়া)। এই ফুলের কয়েক রকম শ্রেণী আছে, ব্রহ্মকমল, রুদ্রকমল (ফেনকমল) ও সূর্যকমল। ফেনকমলের মধ্যভাগ যেন একমুঠো কার্পাশ তুলো। আর সূর্যকমল দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের সূর্যমুখীর মত। পাহাড়ের উচ্চতার এবং আবহাওয়ার তারতম্যে, এই ফুলের আকৃতির সামান্য পরিবর্তন হয়। কেদারনাথ এবং বদরীনাথের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এই দেবলোকের ফুল।

ক্রমে অনুভব কার মাথার ঘুরুনি ও নিঃশ্বাসের কষ্ট। উচ্চতা এখন চোদ্দ হাজার ফুট ছাড়িয়েছে। মনে পড়ে বিজ্ঞানের কথা, পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ বাতাসে অক্সিজেনের অভাব হতে থাকে। সারা শরীরের রক্তকণিকাগুলি ফুস্‌ফুসের সাহায্যে অবিরত বাতাস থেকে এই অম্লজান (Oxygen) গ্রহণ করে বেঁচে আছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করি এবং তাতে আরামও পাই। যতই উপরে উঠি, বাতাসে অম্লজানের পরিমাণ কমতে থাকে, ফলে যতটুকু নিঃশ্বাস টানতে দেহ অভ্যস্ত, বাতাসে সেটুকু অম্লজান না থাকায় শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, মাথার ঘুরুনি, বমি ভাব, চোখে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়। আর তার ওপরে রয়েছে এই চড়াইয়ের গুরুতর শ্রম। জোরে নিঃশ্বাস টানার ফলে যথেষ্ট উপকার আমি পেয়েছি এবং কোন ঔষধপত্র বা টোট্‌কা ব্যবহার করিনি। ক্রমে দুয়েকজন করে শিখ যাত্রীদের নামতে দেখি। হেমকুণ্ডের ধারে শিখদের ধর্মশালা আছে।

শোনা যায় রাত্রে আশেপাশের বরফের পাহাড়ে একরকম জ্যোতি দেখা যায় ; এরা বলে 'বিভূতি'। শিখ তীর্থযাত্রীরা সকলেই হেমকুণ্ডের তীরে রাত্রিবাস করেন। আমাকে উৎসাহ দিয়ে ওঁরা নেমে চলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে আমি এগিয়ে চলি আট দশ পা, তারপরে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াই, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেই, আবার এগিয়ে চলি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, মন আর্তনাদ করে ওঠে, আর যে পারিনা। কোন রকমে ফিরিয়ে আনি ইচ্ছাশক্তি।

সব দুর্ভোগেরই শেষ আছে। অবশেষে চড়াইয়ের দুই ফার্লং অবশিষ্ট থাকতে, শিখদের লালরংয়ের নিশান নজরে পড়ে। হেমকুণ্ডের ধারে শিখ গুরুদ্বারের পাশে প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘ পতাকা। মনে সামান্য উৎসাহ ফিরে পাই। দুটো পর্বতশৃঙ্গের মাঝে বরফে ঢাকা অল্প ফাঁক, যেন রাজবাড়ীর তোরণদ্বার, সেইখানে উঠতে হবে। শেষ পথটুকু কিভাবে উঠেছি স্মরণ নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে সর্বশক্তি একত্রিত করে চিন্তা করছিলাম হেমকুণ্ডের দৃশ্য—সপ্তশৃঙ্গ পর্বতমালার কোলে, যে ছবি উমাপ্রসাদবাবুর 'হিমালয়ের পথে পথে' বইতে দেখেছি।

আমার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। সম্বিত ফিরে পেলাম, ঘুর বাহাদুর একটা ফেনকমল তুলে এনে আমার হাতে দিচ্ছে। দেখি আমি হেমকুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। পাশেই শিখদের ধর্মশালা। তিনদিকে বরফের চূড়ায় ঘেরা স্বল্পপরিসর স্থান জুড়ে একটা প্রকাণ্ড ডিম্বাকৃতি সরোবর। শান্ত সবুজ * রংয়ের স্বচ্ছ জলে বরফের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, একি পৃথিবী ? এত সৌন্দর্যও মর্তের মাটিতে আছে ? মনে হয় স্বর্গের বর্ণনা বোধহয় এই স্থানেই রচনা করা হয়েছে। তপস্যা করবার শ্রেষ্ঠ স্থানই বটে। এইখানেই ত্রেতায় রামানুজ লক্ষ্মণ, দ্বাপরে পাণ্ডুরাজা এবং কলিতে গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর পূর্ব জীবনে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এত পবিত্র আকাশ, বাতাস, জল আর বরফ। আজ তারই মাঝে ফোটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল ব্রহ্মকমল। নিজেকে মহাভাগ্যবান বলে মনে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদলাভের আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন। বলতে ইচ্ছা হয়,

'মহাসম্পদ তোমারে লভিব, সব সম্পদ খোয়ায়ে।
মৃত্যুরে অমৃত করিয়া, তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে॥'

---

* Raman's theory of molecular defraction of light.

হ্রদের তীরে বাঁদিকে লক্ষ্মণের মন্দির, দরজা জানলাহীন। তার মাঝে একটা পাথরের বিগ্রহ। সামনে একটা ছোট্ট ধর্মশালা—তালাবন্ধ। ডানদিকের শিখ ধর্মশালার সামনে হ্রদের তীরে গুরুদ্বার একটা ছোট্ট ঘর আর তার পাশে পতাকা স্তম্ভ। পাহাড়ের চড়াই ভেঙে উপরে হেমকুণ্ডের কাছে আসতে প্রথমেই পড়ে শিখ ধর্মশালা, বেশ বড় কাঠের বাড়ী, টিন ও স্লেটপাথরের ছাদ। ধর্মশালার পাশে জুতা খুলে রেখে, ব্যাগ থেকে তর্পণের মন্ত্র লেখা কাগজ, যব, তিল ও তামার কুশীটাকে নিয়ে লোকপালের মন্দিরের পিছনে সরোবরের কিনারে একখানা পাথরের ওপরে বসে বহুক্ষণ ধরে তর্পণ করি পূর্বপুরুষদের—

'আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা, দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ,
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতা মহোদয়াঃ।
অতীত কুলকোটীনাম্ সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্,
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥'

চোখে নামে ধারা। চিৎকার করে নাম ধরে ডাকি আমার স্বর্গীয় আত্মীয়দের। মনে হয় তাঁরা যেন সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন সরোবরের অপর পারে, সপ্তশৃঙ্গের তলায়।

জোরে বৃষ্টি নামতে সম্বিত ফিরে পাই, কাগজে লেখা মন্ত্রগুলো বৃষ্টির জলে মুছে যাচ্ছে। উঠে গিয়ে শিখ ধর্মশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখি। চারিদিকে ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, বরফের চূড়াগুলো ঢেকে গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে বরফ পড়তে শুরু হয়।

ধর্মশালার বারান্দার কাঠের মেঝেতে একটা করগেট টিনের ওপরে আগুন জ্বালায় ঘুরবাহাদুর। হাত ও পা ভাল করে সেঁকে নেই। ১৫২৫০ ফুট উঁচুতে বরফের রাজ্যে জলের মধ্যে হাত দিয়ে তর্পণ করার ফলে হাত পা আড়ষ্ট ও নীল হয়ে গেছে। তার পরে ব্যাগ থেকে চিঁড়া বের করে হেমকুণ্ডের জলে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেয়ে নেই পেট ভরে। বরফ পড়া একটু কমলে ছবি তুলি কয়েকটা। ধর্মশালার পাশে একটা ঢিবির ওপরে অনাদরে কয়েকটা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করবার যন্ত্র কাঠের বাক্সে ঢাকা পড়ে আছে, তারই পাশ থেকে কয়েকটা ছবি তুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঘন মেঘে ঢাকা থাকায়, আর বরফ পড়ার জন্য, বরফের চূড়াগুলোর স্পষ্টভাবে ছবি নেওয়া সম্ভব হল না। অত্যন্ত শীত বোধ হওয়ায় বারান্দার আগুনের কাছে বসে আছি, দেখি গতকাল ঘাংঘ্রিয়াতে

পরিচিত শিখ গ্রন্থী একখানা ঘর খুলছে। বন্ধ ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে অনেকটা আরাম বোধ করলাম। ক্যামেরার ফিল্ম বদল করে নিয়ে আবার বের হয়ে আসি। বাইরের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। কাঠের ঘরের ভেতরে বেশ গরম। কিন্তু যতটুকু সময় এখানে থাকব ঘরের ভেতরে আটকে থেকে সময় অপব্যয় করতে মন সরে না।

আবহাওয়া মাপবার যন্ত্র রাখা টিবিটার ওপাশ দিয়ে হেমকুণ্ডের জল বয়ে চলেছে নিচে, নাম হয়েছে লক্ষ্মণগঙ্গা। এই জলই পাহাড়ের উপর থেকে ঝরণার আকারে পাঁচ হাজার ফুট নিচে ঘাংরিয়াতে গিয়ে ভুন্দর নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হেমকুণ্ডের ওপারে সপ্তশৃঙ্গ পর্বতমালা থেকে হিমবাহ নেমে এসে হ্রদের জলে পড়ছে। নিস্তরঙ্গ এই হ্রদের জলের একমাত্র বাইরে যাবার পথ লক্ষ্মণগঙ্গা ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বেলা দেড়টা আন্দাজ এখানে পৌঁছেছি। প্রায় সাড়ে তিনটায় তুষারপাত একটু কমে এলে ঘুরবাহাদুর তাড়া দেয় নিচে নামবার জন্য। বরফ পড়ার ফলে পথের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। নামতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। পথে অন্ধকার হয়ে গেলে সমূহ বিপদ। বরফ পড়ে টিবিটার ওপর, হ্রদের তীর চারিদিক যেন সাদা চাদরে ঢাকা পড়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জলের বোতলে হ্রদের অমৃত বারি ভরে নিয়ে ফিরে চলি—স্বর্গ থেকে বিদায় নিই। এখন বেলা পৌনে চারটা বাজে। নামবার সময় ঘুরবাহাদুর পাহাড়ের গা থেকে কয়েকটা ব্রহ্মকমল তুলে এনে দেয়। নজরে পড়ে চড়াইয়ের আকৃতি একজাতীয় অতি সুন্দর ধূসর ও লাল রংয়ের পাখী, চিক্ চিক্ শব্দ করে উড়ে যায় হ্রদের তীরে।

অতি সাবধানে নামতে হয় বরফের কাদা ভেঙ্গে। আলগা পাথর বিছানো পথের ওপরে পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে সন্তর্পণে নেমে চলি। প্রায় দু হাজার ফুট, অর্থাৎ হেমকুণ্ড থেকে একমাইল পথ, এই রকম বরফের মধ্য দিয়ে চলতে হল। আকাশ নির্মল হয়েছে। বিকেলের রোদ পড়েছে চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে। না দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলি। ক্রমাগত এই উৎরাই ভাঙতে হাঁটুতে ব্যথা লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। অজানা শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর জঙ্গলে ঘেরা পার্বত্যভূমি। অন্ধকার নেমে আসবার আগেই পৌঁছাতে হবে ডেরায়, ঘাংরিয়ার ডাকবাংলোতে। হিংস্র জন্তু না থাকলেও অন্ধকারে এই পথে চলা অসম্ভব। পড়ে গেলে যদিও বা প্রাণটা বাঁচে হাত পা

ভাঙবেই। শরীরের ক্লান্তি ও গ্লানি উপেক্ষা করেই পা চালিয়ে দিই। ঠিক দু ঘণ্টা একভাবে চলে, পৌনে ছয়টায় নদীর ধারে এসে বসে পড়ি। এখান থেকেই নন্দনকানন ও লোকপালের পথ দু দিকে চলে গেছে। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে আছে অমূল্য, বীরেন, নিরাপদ আর মহারাজ। তারা সবেগে জড়িয়ে ধরে আমায়। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারি না। বীরেন জিজ্ঞাসা করে, 'কি, চিনতে পারছেন না?'

মাথা নেড়ে বলি, 'হৃদয় আজ আমার পরিপূর্ণ, তাই বন্ধ হয়েছে মুখের ভাষা।'

ক্রমে নেমে আসি আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে। প্রকৃতিস্থ হয় মন, কিন্তু অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ভারী হয়ে ওঠে। বীরেন ও নিরাপদর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে পথ চলি। শুনলাম আজ বিকেলে ওরা এখানে এসে পৌঁছেছে। আজ এখানেও প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের দেরী হচ্ছে দেখে ওরা উদ্বিগ্ন হয়েছে। অবশেষে আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে। ওরা আমায় সযত্নে ধরে নিয়ে আসে ডাকবাংলোতে। আজ ঘাংরিয়া নীলগিরি অভিযাত্রীদের ভীড়ে মুখরিত। ওরা ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছে। লটবহরের তদারকী করছে পিনাকী, প্রাণেশ, ডাক্তার ও চঞ্চল। আমাকে নিরাপদে ফিরে আসতে দেখে সবাই আনন্দে কলরব করে ওঠে। আমার এই একক পদযাত্রার জন্য ওদের দুশ্চিন্তার অবধি নেই। পর্বতাভিযাত্রী হলেও ওরা বাঙ্গালী। ওদের বাঙ্গালী মন আমার বিপদের কথা ভেবে বিচলিত হয়। আমি হেসে বলি, 'ভয় পেয়ে তো বিপদকে ঠেকানো যায় না। মৃত্যু একদিন আসবেই, যতদিন বাঁচি, নির্ভয়ে মনের আশা আকাঙ্খাগুলো পূরণ করে নিই।'

দোকান থেকে ঘি দিয়ে খিঁচুড়ি ও আলুর তরকারী খেয়ে ফিরে আসি ডাকবাংলোতে। আজ আর আমি একা নই। পাশের ঘরে চঞ্চল, ভানু, শৈলেশবাবু ও বীরেন। আমার ঘরে শুতে এল প্রাণেশ ও নিরাপদ। দরজা বন্ধ করা যায় না দেখে অবাক বিস্ময়ে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কি করে আমি একা এই জঙ্গলে রাত কাটিয়েছি গতকাল!

ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। গতকাল রাতে ওরা ছিল গোবিন্দঘাটের ডাকবাংলোতে। আজ সারাদিন পিঠে রুকস্যাক বেঁধে ঘাংরিয়াতে এসেছে হেঁটে। ক্লান্ত দেহ, শুয়ে পড়তেই ঘুম নেমে এসেছে চোখে। আমিও ডায়েরী লিখে শুয়ে পড়ি। রাত সাড়ে দশটা। শুয়ে শুয়ে ভাবি আজ সারাদিনের

কথা। শরীর অতিশয় ক্লান্ত, কিন্তু কি অপার স্বর্গীয় আনন্দে মন ভরে আছে। কঠিন চড়াইয়ের শেষে আশ্চর্য স্বর্গীয় সুন্দর হেমকুণ্ডের শোভা—শান্ত সমাহিত রূপ হিমালয়ের···

॥ ১০ ॥

নন্দনকানন

আজ ২রা অক্টোবর। সকাল ছটায় বীরেনের ডাকে ঘুম ভাঙল। বনময় ঘাংরিয়া ডাকবাংলোতে সকালের আলো আসতে দেরী আছে এখনও। দারুণ স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা, তার ওপরে গতকাল থেকে চলেছে শিলাবৃষ্টি। প্রচণ্ড কন্‌কনে হাড় কাঁপানো শীত। বীরেন ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালিয়েছে, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। ওরা আজ হেমকুণ্ডে যাবে, তাই বীরেন তাড়া দেয়। আমি যাব নন্দনকাননে এবং সেখান থেকে ফিরে আজই নেমে যাব বদরিকাশ্রমের দিকে। আমার এখানে থাকবার মেয়াদ ফুরিয়েছে। প্রাতঃরাশ সেরে বিছানাপত্র বেঁধে রেখে রওনা হই নন্দনকাননের পথে।

নন্দনকাননের স্থানীয় নাম 'ফুঁলো কা ঘাঁটি'। বহু যুগ ধরে হিমালয়ের পরমাশ্চর্য এই স্বর্গোদ্যান বিস্মৃতির আড়ালে লুকিয়েছিল। তাকে সারা পৃথিবীর সামনে আবার তুলে ধরেন জগদ্‌বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি কামেট জয় করে স্মাইথ নেমে আসছিলেন তুষারপাত ও বৃষ্টির মধ্যে। সঙ্গী সাথীরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কে কোথায় চলে গেছেন। স্মাইথ ও তাঁর সহযোগী হল্‌স্‌ওয়ার্থ পথ ভুলে হঠাৎ এই আশ্চর্য উপত্যকায় এসে পড়েন। তের হাজার ফুট উঁচুতে, মধ্য হিমালয়ের বিখ্যাত গিরি-শৃঙ্গগুলির একেবারে কোলের মধ্যে, স্বল্প পরিসর পরমাশ্চর্য এক স্বর্গীয় কানন। এত সুন্দর ও সুসজ্জিত যেন কোন মহান শিল্পী সযত্নে রচনা করেছেন। আত্মহারা হয়ে যান তাঁরা। স্মাইথ এই অত্যাশ্চর্য স্থানটির নামকরণ করেন, 'Valley of Flowers'। কিন্তু মাত্র দুটো দিন সেই কাননে কাটিয়ে সেবারে তাঁরা নেমে আসতে বাধ্য হন। তারপর দেশে ফিরে যান মনে শুধু এক চিন্তা নিয়ে, কবে আবার ফিরে আসবেন।

ছ বছর পরে আবার ফিরে আসেন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ। তাঁবু ফেলে সুদীর্ঘ চার মাস কাটান এই উপত্যকায়। নানা জাতের ফুল, অর্কিড ও গাছের পরিচয়

সংগ্রহ করেন সযত্নে এবং তাদের পরিচয় করিয়ে দেন সারা পৃথিবীর সঙ্গে। আজ তিনি এ পৃথিবীতে নেই, সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সেই মহান আবিষ্কারকের স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে।

আজও লক্ষ্মণগঙ্গা পেরিয়ে আসি। তারপরে বাঁদিকে, অর্থাৎ উত্তর দিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। আজ আমার সঙ্গী ভুন্দর নদী। নদীর পাশ দিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে, স্বল্প পরিসর পায়ে-চলা পথ। মাঝে মাঝেই ভাঙ্গা, ধস নেমে ভেঙ্গে গেছে, আর সেই ধস ডিঙ্গিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। তবে এখন এমন পথে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আর যেন কষ্ট হয় না। এ পথের এটাই দস্তুর।

নদীর পাশে, পথের ধারে, ছোট বড় মাঝারী, নানারকম ফুল ও ফলের গাছ। ডালিম গাছের আকৃতি একরকম গাছে ছোট ছোট লাল ফল, খেতে বেশ টক। পশুচারণের জন্য ফুল প্রায় নেই বললেই চলে।

ঘাংরিয়া থেকে নন্দনকাননের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল, তবে দুরূহ চড়াই বিশেষ নেই। যদিও এই আড়াই মাইলে তিন হাজার ফুটের মত, ওপরে চড়তে হবে।

প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে ভুন্দর নদীর ওপরে কাঠের পুল। তারপরে আবার ভুন্দরের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। উচ্ছল, চঞ্চল, দুষ্টু মেয়ের মত লাফিয়ে নেচে নেচে ভুন্দর চলেছে নেমে, আশেপাশের পাহাড় থেকে বহু ঝরণার বরফ গলা জল এসে মিলছে নদীতে। মাঝে মাঝে নদীর কিনারে বরফের তলা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। কোন জায়গায় নদীর মধ্যভাগ বরফে ঢাকা, নদী অতি ক্ষীণভাবে বয়ে চলেছে বরফের খিলানের তলা দিয়ে।

ধীরে ধীরে চলেছি। পর্বতারোহীর ভাষায়, 'gentle climb'। হঠাৎ মনে হল যেন পথের শেষ—তিন দিকে সুবিশাল প্রাচীরে ঘেরা এক বিস্তৃত উপত্যকা। উঁচু পাহাড়গুলোর মাথার ওপর দিয়ে তুষার-মৌলী গিরিশৃঙ্গগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, প্রখর সূর্যের আলোয় মনে হয় যেন মহামূল্য পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন দেবতারা। আমার পথের বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকের তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি নরপর্বতের অংশ, নাম—'বাম্নী ধর'। ভুন্দর নদী নেমে আসছে ঈষৎ ডানদিকে, অর্থাৎ পুব-দক্ষিণ দিক থেকে, আর উপত্যকাও বিস্তৃত হয়েছে সেই দিকেই। উপত্যকার শেষে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে 'রতোবন পর্বত' (২০, ২৩০ ফুট), তার অল্প দূরেই নীলগিরি পর্বত (২১, ২৪০ ফুট) হিমালয়ান এসোসিয়েশনের অভিযাত্রীদের লক্ষ্য।

এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার মাত্র কয়েক জায়গায় ভূর্জপত্র বৃক্ষের ছোট ছোট জঙ্গল, আর তিন দিকে পাহাড়গুলোর কোমর অবধি প্রায় সমতল খোলা জায়গা, ঘাসে ভর্তি। এই সব স্থানে নানা রংয়ের, নানা জাতের রকমারী মৌসুমী ফুল জন্মায়—আপন ইচ্ছায়, অনাদরে। শীতকালে সাদা বরফের পুরু আস্তরণে ঢাকা থাকে এই উপত্যকা। শীতের শেষে, মে-জুন মাসে বর্ষার জল পড়তেই বরফ গলতে শুরু হয়। সেই সঙ্গেই শুরু হয় ফুলের মরসুম। মে-জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি হাজার রকমের ফুল ফোটা ও ঝরার পালা। শুনেছি এখানে ফুল বিশেষের স্বতন্ত্র এলাকা, যেন কোন নিপুণ রূপদক্ষ মালীর হাতে অতি যত্নে তৈরী সাজানো বাগান। ভগবানের কি অপরূপ সৃষ্টি! বিজ্ঞান বলে, ফুলেরও জাতিভেদ আছে, শ্রেণীগত ধর্ম আছে, তাই স্বতন্ত্র জন্ম সময় ও বাসস্থান। এই একই কারণে, শুধুমাত্র একই শ্রেণীর ফুল একই জায়গায় জন্মায়, অন্য জাতের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানেই ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ দেখতে পান ব্রহ্মকমল, সাদা ও লাল রংয়ের পটেনটিলা, ব্লু-পপি, আরও কতশত রকমের ফুল। তিনি এখানে কেবল প্রজাতি সংগ্রহ করেন নি। এখান থেকেই তিনি নীলগিরি পর্বতে আরোহণ করেছেন ও রতোবনে আরোহণ কবাব চেষ্টা করেছেন।

একটা পাথরের স্তূপের ওপরে বসে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকের শোভা দেখি আর দু একটা ছবি তুলি। ভাবি—আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে, মহাভারতের যুগে, মহারাজা পাণ্ডু মাদ্রী প্রভৃতিদের নিয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধাব করতে সুদীর্ঘকাল এই স্বর্গোদ্যানে বাস করে গেছেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমেব নামানুসারে এই উপত্যকার নাম ভুন্দর এবং মাত্র কয়েক মাইল দূরে পাণ্ডুকেশ্বর আজও তাঁর সাক্ষ্য বহন করে বর্তমান। হিমালয়ের এইসব অঞ্চলে সর্বরকমের রোগ, জরা ও মৃত্যুর প্রতিষেধক গাছ-গাছড়া, শিলাজিৎ ইত্যাদি জন্মায়। সেকালের জ্ঞানীরা তাঁদের সন্ধান ও প্রয়োগ বিধি জানতেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ও কালিদাসের মহাকাব্যে এইসব ঔষধির উল্লেখ আছে। দুঃখ হয় নিজেদের আত্মবিস্মৃতির জন্য। নিজেদের সব কিছু থাকা সত্বেও, আজ আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় পাশ্চাত্যের দিকে।

কতক্ষণ একভাবে বসে আছি। চমক ভাঙ্গে, দেখি কুলিদের পিঠে মাল নিয়ে চলেছে নীলগিরি অভিযাত্রীদের প্রথম দল তাদের বেস্ ক্যাম্প বা মূল শিবির প্রতিষ্ঠা করতে। আমায় দেখে সবাই পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে কাছে

এসে বসে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে আবার এগিয়ে চলে নন্দনকাননের অপর প্রান্তে। বিদায় বেলায় একসঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলে নেই আমার ক্যামেরায়। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ওদের যাত্রাপথের দিকে—বাঙ্গালীর জয়যাত্রা পথে।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। ঘুরবাহাদুর বলে তাড়াতাড়ি না ফিরলে আজ বিকেলের মধ্যে পাণ্ডুকেশ্বরে পৌছানো যাবে না। আকাশ নির্মল, প্রখর রোদ উঠেছে, কিন্তু এই উপত্যকায় সেই রোদ অসহ্য মনে হয় নি।

ফিরে চলি মর্তের স্বর্গোদ্যান থেকে। আমার সীমাবদ্ধ ছুটির দিনগুলির নির্দিষ্ট কর্মসূচী ভাঙ্গতে পারি না। এখনও যে অনেক বাকী। ফিরে চলেছি শুধু একটি ইচ্ছা নিয়ে, আবার আসবো, যদি বেঁচে থাকি!

এক ঘণ্টায় ফিরে আসি ঘাংরিয়ায়। অমূল্য আর পিনাকীর সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ি, বদরীনাথের পথে। অমূল্য ডাকে দেবার জন্য একগাদা চিঠি দেয়।

একটানা উৎরাইয়ের পথ চলতে হাঁটুতে ব্যথা লাগে আর পায়ের আঙ্গুলগুলো টনটন্ করে। লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামি। ঘাংরিয়ার কাল রংয়ের ঘন জঙ্গল পার হয়ে এলাম পথের ধারে একটা হাত দেড়েক লম্বা তামাটে রংয়ের সাপ আহত হয়ে পড়ে আছে। অল্পক্ষণ আগে দুটি অল্পবয়সী পাহাড়ী ছেলে এ পথ দিয়ে গেছে। তারা হয়তো সাপটাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। মাথাটা থেঁতলে গেছে, শরীরটা এখনও কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ধীরে ধীরে। সাপটা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের বোড়া জাতীয় সাপের মত।

ক্রমে ভুন্দর গ্রামে এসে পড়ি। গতকাল নীলগিরি অভিযাত্রীরা এখানে এসে অনেক চেষ্টা করেও গ্রামবাসীদের ছবি তুলতে সক্ষম হয় নি। বীরেন আমায় বলেছে—এ গ্রামের মেয়েরা কিছুতেই ছবি তুলতে চায় না। বেশী উত্যক্ত করলে অনর্থ বাধতে পারে তাই ওরা ছবি তোলেনি। একটা বাড়ীর স্বল্প পরিসর আঙ্গিনায় রামদানা শস্য শুকোতে দিয়েছে গৃহস্থবধূ, কুলো দিয়ে ঝেড়ে বেছে দিচ্ছে। আমার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। আমি সেই বাড়ীর আঙ্গিনার পাশে পাথরের দেওয়ালের ওপরে বসে পড়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'ইয়ে রামদানা হ্যায়?' 'হাঁ' বলে বধূটি আমার দিকে ফিরতেই একটা রঙ্গীন ছবি তোলা সারা হল। সেই সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'পানী দে মায়ী।' অল্প একটু হেসে মেয়েটি এক ঘটি জল এনে দিল। জল পান করে আবার চলতে থাকি।

বিকেল হয়ে আসছে, সন্ধ্যার আগেই পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছতে হবে। ইচ্ছা ছিল পুনর্গায়ে স্বামী অরূপকৃষ্ণ তীর্থের সঙ্গে দেখা করে যাব। কিন্তু এ যাত্রায় আর তা সম্ভব হল না। শুনেছি এই বৃদ্ধ সাধুটি বাঙ্গালী ও শিক্ষিত। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গত ৭।৮ বছর ধরে এখানে আছেন। এর আগে তিনি বহু বছর হরিদ্বার ও হিমালয়ের অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে কাটিয়েছেন।

আজ সারাদিন রোদ ছিল। বিকেলের দিকে মেঘ করে সামান্য একটু বৃষ্টি হয়েছে, তবে আমার চলা বন্ধ হয় নি। বেলা সওয়া পাঁচটায় গোবিন্দঘাটে এলাম। সন্ধ্যা হতে আর বেশী দেরী নেই। দোকানে চা মিলল না চৌকীদারপুত্র আনন্দ সিংয়ের কাছ থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে ব্রহ্মকমলকটি ও হেমকুণ্ডের জল-ভরা জলের বোতলটা রেখে দিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললাম। অলকানন্দার ধার দিয়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করে পাণ্ডুকেশ্বরে এসে পৌঁছলাম পৌনে ছটায়।

অন্ধকার হয়ে আসছে, কালি কম্‌লি ধর্মশালার দোতলার একটা অন্ধকাব ছোট ঘরে আশ্রয় মিলল। অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন ঘরের মেঝেতে ততোধিক নোংরা একটা সতরঞ্চি পেতে তাব ওপরে জিনিসপত্র রেখে বিছানাটা খুলে ফেলি। দেওয়ালে বড বড ফাটল। মাটির দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গিতে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তবু খানিকটা অন্ধকার দূব করতে চেষ্টা করি। ঘুরবাহাদুব জিনিসপত্র নামিয়ে রেখেই অদৃশ্য হয়েছে। শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায়, শ্রান্তি ও ক্লান্তির জন্য ঘরটাকে ঝাঁট দেওরা দূরে থাকুক, বিছানা পাতা ও জামা কাপড বেব করতেও হাত চলতে চায় না। মনকে বোঝালাম এইখানে এই অন্ধকার নোংরা ঘরে কত শত পুণ্যার্থী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিত্য আশ্রয় নিয়েছে—চলার পথে স্বল্পকালের জন্য, আবার চলা শুরু করেছে। শুধু একমাত্র লক্ষ্য, ধ্যান ও জ্ঞান—বদরীবিশাল দর্শন—অলকাপুরী, স্বর্গারোহিণী, মহাপ্রস্থানের পথের চিন্তা নিয়ে যুগ যুগান্ত ধরে অবিরত চলেছে মানুষ এই পথে। দেবভূমিতে যাবার সময়ে শতসহস্র বাধা, দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ-স্বীকার ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথের ধারে এই ক্ষুদ্র বিলাসিতা বর্জিত আশ্রয়গুলির ধূলিতে শুদ্ধচিন্তা আর কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ন বর্তমান। অতীত দিনের তপশ্চর্যার প্রভাব অবশিষ্ট রয়েছে আমার অন্তরাত্মাকে শোধন করবার জন্য, বাইরের নোংরামি তার খোলস মাত্র।

ধর্মশালার সামনে রাস্তার কলের জলে মুখ হাত ধুয়ে লালার দোকানে এসে

বসলাম। এক গেলাস চা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কিছু খেতে পাওয়া যাবে কি না? লালাজী বললেন, অনেক দেরীতে পুরি ভাজা হবে। বেশ জ্বর হয়েছে। এখানে বসে থাকার মত শরীরের অবস্থা আর নেই আমার। আমার সঙ্গে চা পান করছিল স্থানীয় পুলিস-চৌকীর জমাদার। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল পুলিস ফাঁড়ীর সামনে একটা হোটেলে। এখানেও বলে, রুটি বানাতে একঘণ্টা দেরী হবে। কোন কথা না বলে অতিকষ্টে ফিরে আসি ধর্মশালায়। সামনের দোকান থেকে ডালডায় ভাজা আধপোয়া পুরি ও কিছু বোঁদে দিয়ে যায় দোকানদারের ছোট ছেলে।

আজ সকালে ঘাংরিয়াতে নীলগিরি অভিযানের ডাঃ ঘোষাল আমার শরীরের অবস্থা দেখে কিছু ওষুধ দিয়েছিল। সেই ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। গতকাল হেমকুণ্ড থেকে ঘাংরিয়াতে ফিরে, সন্ধ্যার পরে জামা কাপড় অধিকাংশই খুলে রেখে জঙ্গলে গিয়েছিলাম, প্রকৃতির তাড়ায়। সম্ভবত সেই সময়েই ঠাণ্ডা লেগেছে। তাছাড়া গত ন তিন দিন ধরে শরীরের ওপরে নিদারুণ পীড়ন চলেছে। কড়া এলোপ্যাথী ওষুধ খেতে ইচ্ছা হয় না। বড়ই দুর্বল করে দেয়, পাহাড়ে চলবার শক্তি দেয় আরও কমিয়ে। কিন্তু নিউমোনিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ওষুধের শরণ নিতে হল একদিনে তেরো মাইল হেঁটেছি—চড়াই ভেঙেছি তিন হাজার ফুট, সাত হাজার ফুটেরও বেশী উৎরাই ভেঙেছি। শরীরে আর কত সয়!

॥ ১১ ॥

হনুমান চটি

পাণ্ডুকেশ্বরের ধর্মশালার ঘরে ঘুম ভাঙলো সকাল সাড়ে ছটায়। এখনও বেশ জ্বর আছে, তার সঙ্গে দুর্বলতা। নিচের রাস্তার কলে মুখ হাত ধুয়ে সামনের দোকান থেকে চা খেয়ে, ধীরে ধীরে বিছানাপত্র বাঁধা ছাঁদা করছি। ঘুরবাহাদুর আমাকে তাড়া দেয়। বিরক্ত হয়ে ধমক দিতেই সে কোথায় চলে যায়।

বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু নির্মল আকাশ। মিষ্টি রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে যোগ-বদরী মন্দিরের সামনে এসে দুটো ছবি তুললাম। সামনের পাহাড়ে পাণ্ডুরাজা তপস্যা করেছিলেন। হেমকুণ্ড, নন্দনকানন ও পাণ্ডুকেশ্বর ব্যাসদেবের

বর্ণনায় অমর হয়ে আছে। সদর রাস্তার ওপরে একটু ঘুরে বেড়িয়ে আবার ফিরে আসি ধর্মশালায়। এখানে সরকারী চিকিৎসালয়, ডাকঘর ও ডাকবাংলো আছে। জোশীমঠের পরে বদরীনাথ পথের বৃহত্তম জনপদ। এবারে যাত্রার উদ্যোগ করি, কিন্তু ঘুরবাহাদুরের দেখা নেই। খোঁজাখুঁজি করে দেখি, লালার দোকানের উপরতলার চটিতে বসে আছে: বলল, সে আর আমার সঙ্গে যাবে না। পূর্বদিনের পরিচিত জমাদারজী অনেক করে বোঝালে তাকে, কিন্তু সে নির্বিকার। তাকে মনে করিয়ে দিলাম, সে চুক্তিপত্রে সই করে এসেছে আমার সঙ্গে। অনেক টাকা আগামও নিয়েছে। কিন্তু ঘুরবাহাদুর নির্বিকার। অগত্যা পুলিস ফাঁড়িতে এলাম। সেখানে সে অভিযোগ করলে, আমি নাকি তাকে মারতে তাড়া করেছিলাম। তখন তাদের বুঝিয়ে বললাম যে সকালে ওর তাড়ায় অস্থির হয়ে, হাতের আস্তিন গুটিয়ে কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখিয়ে বলেছিলাম যে বেলা নয়টার আগে বেরুতে পারবো না। আমি তাকে আস্তিন গুটিয়ে মারতে যাইনি। বুঝতে পেরে সে ক্ষমা চাইল। কিন্তু তখন আমি সবাইকে তার এ কয়দিনের ব্যবহারের কথা খুলে বললাম। লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও ভবিষ্যতে ভাল ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সকলের অনুরোধে আমি তাকে সঙ্গে নিতে রাজী হলাম।

পুলিস ফাঁড়ির নাটক শেষ করে, রওনা হলাম বদরীনাথের উদ্দেশে। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। প্রখর রোদ উঠেছে। একশ দু ডিগ্রী জ্বর আর পায়ের ব্যথা নিয়ে চলেছি খুঁড়িয়ে, অলকানন্দার ধার দিয়ে সামান্য চড়াই উৎরাই পেরিয়ে। কিন্তু আজ বিশেষ তাড়া নেই। কোন রকমে সাত মাইল পথ অতিক্রম করে আজকের মত বিশ্রাম হনুমান চটিতে।

বেলা সওয়া এগারোটায় দেড় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে 'বিনায়ক' চটিতে এলাম। ২।৪টি দোকান আছে, চটিও আছে কয়েকটা। তবে দোকানগুলো অধিকাংশই এখন যাত্রীর অভাবে বন্ধ। অবশিষ্টগুলোও শীতের মরসুমের জন্য বন্ধ হয়ে যাবার আয়োজন করছে, অর্থাৎ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

অলকানন্দার তীরে বিনায়ক চটির চারপাশের নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর। বিশেষত পেছন দিকে মুখ ফেরালে আকাশের গায়ে সবুজ পাহাড়ের দৃশ্য ভারি চমৎকার লাগে, যেন সুন্দর একখানি রঙীন চিত্র।

রাজপুতানাবাসী একটি যাত্রীদল পথের উপরে একটা ঝরণার ধারে বসে দুপুরের আহারাদি করছে ছাতু দিয়ে। একটি বৃদ্ধার কাছ থেকে একটা লোটা

চেয়ে নিয়ে, ঝরণার জল পান করে আবার চলা শুরু করি। পথ চলতে শরীর গরম হয়ে ঘাম হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে জ্বরের তেজও কমছে মনে হয়। এপথে ঝরণার জল খাওয়া সব সময়ে নিরাপদ নয়। হয়ত পাহাড়ের উপর থেকে গ্রামের ময়লা জলও নামছে নদীর দিকে। তাই জল পানের উপযোগী ঝরণাগুলোতে একটা লোহার নল লাগানো আছে. শুধু সেইসব স্থানেই জল ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদবাবু বলে দিয়েছেন, এইসব পাহাড়ের জলে প্রচুর গুঁড়া অভ্র মিশ্রিত থাকে।

অভ্র মিশ্রিত জল পেটে গেলে নানারকমের অসুখ হতে পারে। কাজেই পাহাড়ী পথে ঝরণার জল সবসময় ছেঁকে খাওয়াই উচিত।

বিনায়ক চটি ছেড়ে কিছুদূর আসতেই সামনে নজরে পড়ে অলকানন্দার ওপরে কাঠের একটা জীর্ণ ঝোলাপুল। পুলের ওপারে পাহাড়ের গায়ে পায়ে-চলাপথ, উপরের দিকে উঠে গেছে। সর্বনাশ, এই ঝুলা পেরোতে হবে? না। পথচারীদের কাছে শুনলাম, ওটা বদরীনাথের পথ নয়। 'খচর চড়া' গ্রামে যাবার পথ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

প্রায় দেড়মাইল পথ অলকানন্দার বাঁপাশ দিয়ে চলে, বেলা প্রায় বারোটায় 'লাম্‌বগড় চটি'তে এলাম। লাম্‌বগড় পাণ্ডুকেশ্বর থেকে তিন মাইল। মোটামুটি বড় জায়গা। কয়েকটা দোকান ও চটি আছে। তবে এখন প্রায় জনশূন্য। এখানে চটি ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে বদরীনাথ মন্দির কমিটির নূতন সুন্দর বাড়ী আছে, পূর্বাহ্নে অনুমতি সংগ্রহ করলে বিনামূল্যে আশ্রয় পাওয়া যায়। মাত্র একটি দোকানে কিছু পকৌড়া, আলুর সব্‌জী আর চা পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল আটা ও চিনি দিয়ে ডালডায় ভাজা একরকমের মিষ্টি, ছোট ছোট গজার মতো, নাম 'সকলমারা'। মনে মনে ভাবি—বদরীনাথের পথের এইসব চটিতে মাছি পরিবৃত, নোংরা, বাসি খাবার। আমার আগে কতলোককে না জানি মেরে ফেলেছে, তবু একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক না, আমায় মারতে পারে কিনা! অতএব দোকানে বসে 'সকলমারা' খাওয়া হল। ঘামে ভেজা গেঞ্জি, শার্ট খুলে রোদে শুকাতে দিয়ে, অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে আবার উঠি। হনুমান-চটি আরও চার মাইল।

আপন মনে পথ চলেছি। আশ্চর্য সুন্দর অলকানন্দার দুই পাশে নয়ন-সুখকর দৃশ্যাবলী। পাহাড়ের শ্রেণী, নদীর সুনীল জলধারা, নানা বর্ণের পাথরের নুড়ি বিছানো নদীর গতিপথ, নীল আকাশে দুয়েক খণ্ড শরতের

মেঘ,—যেন এক বিরাট শিল্পীর হাতে সযত্নে আঁকা একখানি ছবি—ধীরে পরিবর্তন হয়ে চলেছে দৃশ্যের, সুন্দর থেকে সুন্দরতর মহাপ্রস্থানের পথ। দেবলোকের বাড়ীর বাইরের বাগান যেন। ক্রমশ রাজবাড়ীর কাছে পৌঁছানোর অনুভূতি।

লাম্‌বগড় পেরিয়ে অলকানন্দার লোহার সেতু পার হয়ে আবার চলা। এবারে নদীর ডান দিক দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। পথ চলতে আলাপ হল এক বৃদ্ধ পথিকের সঙ্গে। ইনি বদরীনাথের উপরে অবস্থিত মানাগ্রামের অধিবাসী। নাম রামদয়াল সিং। সবল, সুস্থ, হাস্যমুখর বৃদ্ধ। আসছেন জোশীমঠ থেকে পদব্রজে, পিঠে একটা পুঁটুলী পশমিনার চাদরে বাঁধা। হাতে একখানা পাকা লাঠি। চলেছেন প্রকাণ্ড ভারী ও মজবুত নাগ্‌রা পায়ে। আজ সন্ধ্যার আগেই তাঁকে পৌঁছতে হবে মানা গাঁয়ে, বদরিকাশ্রমের তিনমাইল উপরে। ভাবতেই পারি না। শুনেছি হনুমান চটি থেকে বদরীনাথ পাঁচমাইল, শুধুই দুরারোহ চড়াই। এই বৃদ্ধ কি করে আজই যাবেন গাঁয়ে? এখনও যে বারো মাইল পথ! রামদয়াল হেসে বলেন, এখনও তাঁর দৃষ্টিশক্তি অম্লান আছে। তিনি রাত দু প্রহর পর্যন্ত পথ চলতে সক্ষম। হাতজোড় করে অনুমতি চাইলাম একটা ছবি নেবার জন্য। সানন্দে রাজী হ'য়ে ছবি তুলতে বসলেন পথের ধারে একটা পাথরের উপরে। পথচারী একজন সাধুও ছবি তুললেন। বৃদ্ধ রামদয়াল সিং আমায় একটা ঘোড়া নেবার পরামর্শ দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন।

নদীর অপর পার দিয়ে নূতন পথ তৈরী হচ্ছে দ্রুতগতিতে—মোটর গাড়ীর পথ। আর মাত্র বছরখানেকের মধ্যেই এ পথের যাত্রীদের আর পায়ে হেঁটে, কষ্ট করে পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে না। কিন্তু যন্ত্রদানবের পদার্পণে তাড়াতাড়ি দীর্ঘপথ অতিক্রম করার ফলে পথের সৌন্দর্য উপভোগের সময় পাবে না কেউ। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির আশঙ্কা থাকবে প্রতিনিয়ত। আর আসবে সভ্যতার নানা গ্লানি, শঠতা ও প্রবঞ্চনা!

মানাবাসী রামদয়াল সিংয়ের মুখে শুনেছি, মানা গ্রামেও দেখবার অনেক কিছুই আছে। ব্যাস-পুস্তক, গণেশজীর মন্দির, ভীম পাথর ইত্যাদি। সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত মানা গ্রাম থেকে মাত্র দুই মাইল এগিয়ে বসুধারা, বিখ্যাত ঝরণা, জলকণায় নানা রংয়ের রামধনু সৃষ্টি হচ্ছে অবিরত। মানা গ্রামের নিচেই অলকানন্দা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম। প্রাকৃতিক শোভা নাকি অপূর্ব

এই স্বর্গারোহিণীর পথ। আবার যদি এ পথে আসা হয়, ইচ্ছা রইলো অলকা-পুরীর সৌন্দর্য দেখবার।

দুপাশে জঙ্গলে ভরা নদীগর্ভের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে, সামান্য উঁচুনিচু পথ। নূতন পথটিতে শ্রমিকরা কাজ করছে, বড় বড় পাথর সরানো হচ্ছে, মাঝে মাঝে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানো হচ্ছে। ক্রমে পথ এসে বিস্তীর্ণ এক নদী অথবা ঝরণার গর্ভের পাশ দিয়ে ছোট ছোট দুটো পাহাড়ের ওপরে উঠল। শুষ্ক নদীগর্ভের বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে পথ চলি। তারপরে পাহাড় দুটোর চড়াই পেরিয়ে, একটা বড় ঝরণার ওপরে সেতু পার হয়ে হনুমান চটি। এখন বেলা তিনটে।

চারিদিকে উন্নত পাহাড়ের শ্রেণী, নদীর গর্ভ বেশ চওড়া, উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। অলকানন্দা এখানে একটি বড় পাহাড়কে বেষ্টন করে একটি বাঁক নিয়ে আবার প্রবাহিতা হয়েছে। চতুর্দিকে অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। নদীর ধারে একটা বড় ঝরণার ওপারে প্রায় দুইশত গজ পাথরে বাঁধানো রাস্তার দুই পাশে কয়েকটা বাড়ী গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ী কখানি নিয়েই হনুমান-চটি। একটি পুলিস-চৌকী ও অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্রও আছে। হনুমানজীর মন্দির আছে। প্রবাদ আছে—দ্বাপরে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে সাক্ষাৎ পান রামানুচর বীর হনুমানের। বৃদ্ধ হনুমান রাস্তার পাশে শুয়ে ছিলেন, রাস্তার ওপরে পড়ে ছিল তাঁর লেজ। ভীম যাচ্ছিলেন সেই পথ দিয়ে। তিনি হনুমানকে লেজ সরিয়ে নিয়ে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। হনুমান তাঁকেই লেজ সরিয়ে দিয়ে পথ করে নিতে বললেন। মহাবীর ভীমসেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও লেজটাকে একচুলও সরাতে না পেরে পরাজয় স্বীকার করলেন। তখন পবন-নন্দন হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, একই পিতার পুত্র তাঁরা দুজনে। আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে হনুমানজীকে পাণ্ডব পক্ষে সাহায্য করার প্রস্তাব করেন ভীম। হনুমানজী তাঁর লেজ থেকে একগাছি লোম ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রথের ধ্বজায় বেঁধে রাখতে। কুরুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অর্জুনের রথের ধ্বজায় বাঁধা সেই লোমের গর্জনে।

বীর হনুমানজীর স্মৃতি বিজড়িত এই হনুমান চটি এযুগেরও একটি স্মরণীয় স্থান। দীর্ঘ পদযাত্রার প্রায় শেষে, বদরীনাথ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল আগে এই চটি। কিন্তু ঐ পাঁচ মাইল পথ বড়ই কষ্টকর। পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রীর কাছে প্রাণান্তকর এই অল্প পথ পাড়ি দেবার আগে হনুমান-চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম

করে নিলে কিছু উপকার হয়। এখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে বদরীনাথের পথে যাত্রা করলে কষ্ট তত বেশী হয় না।

হনুমান চটির কালি-কম্‌লি ধর্মশালার দোতলার একটা ছোট ঘরের মেঝেতে বিছানায় বসে ডায়েরী লিখছি মোমবাতির আলোয়। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সাত হাজার ফুটের বেশী উঁচু, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, হিমশীতল হাওয়ার জন্ত একখণ্ড পাথর দিয়ে একটিমাত্র জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। দরজাটাও একই ভাবে ভেজিয়ে রেখেছি। ছিট্‌কিনীর বালাই অনেকদিন আগেই বোধহয় গত হয়েছে। সারি সারি দুপাশের ঘরে আজ অনেক লোক। আমার ডান পাশের ঘরে একদল শিখ যাত্রী, মেয়ে পুরুষ মিলে এগারোজন, একটা বড় ঘরের মধ্যে শুয়ে পড়েছেন। আমাদের ঘরগুলোর সামনে প্রশস্ত বারান্দায় আজমীর জেলার দেহাতী তীর্থযাত্রীরা সুর করে ভজন গাইছেন। এদলে বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশী। বাঁ পাশের ঘরে একদল পাহাড়ী দোতিয়াল (মোট বাহক) মদ খেয়ে হল্লা করছে।

এখানে দুটো ধর্মশালা আছে, দোকানও আছে কয়েকটা। বাকী বাড়ীগুলো অধিকাংশই খালি। ঝরণার জলে মুখহাত ধুয়ে, গেঞ্জি ও রুমাল কেচে দিয়ে, গরম জামাকাপড় পরে দোকানে খেতে আসি। ধর্মশালার শিখ সহযাত্রীদের একান্ত আগ্রহে খানিকটা ভাত নিতে বাধ্য হই। ওদের ডাল তরকারী ফুরিয়েছে, অথচ আমাকে খাওয়াতে চায়। মনে কষ্ট পাবে দেখে শুধু ভাতটুকু নিয়ে দোকানে বসে আলুর তরকারী কিনে খেয়ে নেই ভাতটুকু। দুটো বেসনের লাড্ডু নিয়ে রাতের আহার সমাধা করি বেলা সাড়ে পাঁচটায়। শেষ বেলার রোদ পড়েছে নদীর ওপারের পাহাড়গুলোর গায়ে। মাঝখান দিয়ে অলকানন্দার নীল জলে রোদের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। গরম চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে অল্পক্ষণ পাইচারি করি পথে। দেখি চারিদিকের শোভা। কাঠের মোটা মোটা কুঁদো খচ্চরের পিঠে বেঁধে চলেছে দেশীয় ঠিকাদার বদরীনাথের পথে। ওরাও এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। মনে হয়, ওদের জিজ্ঞেস করি খচ্চর ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা। আবার ভাবি, চামোলির ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা—কোনও জানোয়ার অথবা মানুষের পিঠে চড়ে তিনি তীর্থে ঘোরেন না। মন স্থির হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই। এ তো বিলাসিতার পথ নয়। সামান্ত অর্থের বিনিময়ে আমার প্রয়োজনে অন্তকে কষ্ট দিয়ে এপথে চলতে মন চায় না।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, বাইরে সর্বক্ষণ প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া চলছে। ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে স্যুটকেশটার ওপরে একটা মোমবাতি বসিয়ে, প্রাত্যহিক রোজ-নামচা লিখি। পাশের ঘরের মত্ত পাহাড়ীরা বড গোলমাল করছে। অল্পক্ষণ পরেই পুলিসের লাঠির গুঁতোয় ঠাণ্ডা হয় তারা। বোধহয় শিখ যাত্রীরা বিরক্ত হয়ে স্থানীয় চৌকীর সিপাহীকে ডেকে এনেছে। বেচারারা আনন্দটা একটু বেশী মাত্রায় করে ফেলেছে, তাই এখন শাস্তি পাচ্ছে।

লাম্‌বগড় থেকে হনুমানচটি চার মাইল। সারা পথে দেখলাম ডিনামাইট দিয়ে পাহাড ফাটিয়ে, পাহাডের গা দিয়ে নূতন রাস্তা বার করা হচ্ছে। সীমান্তে আমাদের ভাল রাস্তা চাই সর্বাগ্রে, মানা গিরিবর্ত্ম এখান থেকে বেশী দূরে নয়। লালচীনের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। স্বাধীন ভারতের মাথার মুকুট, দেবতাত্মা নগাধিরাজকে রাখতে হবে শত্রু কবল মুক্ত। মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দেশের প্রাণধাবার উৎস, হিন্দুধর্মের মূলস্তম্ভ আজ পররাজ্যলোভী তস্করের হীন আক্রমণে বিপন্ন।

তাই তো আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে আজ, সারা ভারত নতুন করে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রতিটি নরনারীর মধ্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছে—

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান,……।'

রাত আটটা বেজেছে, মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পডি। মেঝের তক্তার ফাঁক দিয়ে হিমঠাণ্ডা উঠে আসে, আর আর আসে ছোট ছোট আরশুলা। কম্বলে আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করি।

॥ ১২ ॥

বদরীনাথ

৪ঠা অক্টোবরের সকাল। শীতের জন্য কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে উঠি সকাল সাডে ছটায়। পাঞ্জাবীদের কাছ থেকে খানিকটা গরমজল সংগ্রহ করে মুখহাত ধুয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে বেখে বেরিয়ে আসি পথে। পূর্বদিনের দোকানে গিয়ে নোংরা আসনে বসে চা দিতে বলি, সেই সঙ্গে অনুরোধ করি কেটলীতে কিছু টাটকা চায়ের পাতা দিতে। পথের এসব দোকানে উনুনে চড়ানো থাকে.ময়লা একটা বড় এলুমিনিয়মের কেটলী।

সারাদিন তাতে জল গরম হচ্ছে। সকাল বেলায় এক মুঠো চা-পাতা সেই কেটলীতে ফেলে দিয়ে বহুবার চা তৈরী চলে সেই একই চা-পাতায়। স্বাদ ও গন্ধের বালাই নেই। দোকানীর কাঠের উনুনের ধার ঘিরে শিখ তীর্থযাত্রিণীরা বসে গরম গরম পকৌড়া খাচ্ছেন। আমিও একপাশে বসে কিছু পুরি, তরকারী, মিষ্টি ও চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি বদরীনাথের পথে। সকাল আটটা বেজেছে নির্মল আকাশে রোদ উঠেছে। আমারও জ্বর ছেড়েছে, তবে শরীর বেশ দুবল। হাঁটুর ব্যথাটাও আছে, কিছুটা কম।

হনুমান চটি ছেড়েই অলকানন্দার ওপরে লোহার বড় সেতুটা পার হয়ে পথ চলেছে নদীর পাশ দিয়ে, খাড়া প্রাচীরের মত পাহাড়ের গা বেয়ে। এবারে নদীর ডান পাশের পাহাড়ের গায়ে আল্‌সের মত পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। উঁচুনিচু বিশেষ নেই। নদীর দুই পাশের পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে এগিয়ে এসে নদীপথকে যেন সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে। সামান্য কাঁটাগাছ ও ঝোপঝাড় ছাড়া পায়ে চলা এই পথের আশেপাশে বড় গাছ আর নেই। পাথরের গায়ে, পথের ঝোপের মত খর্বকায় কাঁটা গাছে ছোট ছোট লাল এবং নীল রংয়ের ফল ধরে আছে। অনেকটা আমাদের দেশের কুচ ফলের মত দেখতে, খেতে খুব টক। নাম গৌরীফল। দু তিন রকমের ছোট ছোট পাখী দেখতে পাচ্ছি। কোন পাখীর ডানা দুটি কালো, পেট ও লেজটা লাল আর মাথায় একটু সাদা ছোপ। এ ছাড়া আমাদের দেশের দোয়েল জাতীয় ধূসর রংয়ের পাখীও আছে, ওদের পেটটা সাদা। আর আছে কালো রংয়ের বড় বড় কাক।

হনুমান চটি থেকে মাইলখানেক এগিয়ে একটা অতি ছোট পাহাড়ী গ্রাম, তাতে একটা ক্ষুদ্র চায়ের দোকান। এখানে ঝরণার জলপান করে আবার চলা শুরু করি। আজ পথের সঙ্গী কালকের পরিচিত পাঞ্জাবী শিখদের দলটি। দলে আছেন দুই ভাই—তাঁদের উভয়েরই দাড়িগোঁফ সাদা। তাঁদের মাতা-ঠাকুরাণী, দু ভাইয়ের স্ত্রীরা ও বালিকা কন্যা এবং ওদের প্রতিবেশী দুজন প্রৌঢ়া মহিলা। আর আছেন দুজন অনুচর সহ একজন বৃদ্ধ শিখ সন্ত, এঁদের গুরুদেব। গুরুদেবের জন্য ঘোড়া, কিশোরী কন্যা ও স্ত্রীদের জন্যও ঘোড়া। কিন্তু বৃদ্ধা মা ছোট ছেলেকে নিয়ে পদব্রজে চলেছেন আমার সঙ্গে।

ছোট্ট গ্রামটি ছাড়তেই শুরু হয় চড়াই আর উৎরায়ের পথ। ছোট বড় পাহাড়ে এঁকে-বেঁকে চড়া, আবার অল্প নেমে আর একটা পাহাড়ে চড়া। সঙ্গের স্থূলবপু বৃদ্ধা শিখ মহিলাকে সাহস দিই, 'যব নেহি সকেগা, মেরে কান্ধাপর

আশ্রা কিজীয়ে, ম্যায় আপ্‌কা লেড়কা হুঁ”। বৃদ্ধা হাঁফাতে হাঁফাতে শুধু বলেন, ‘গুরুজী, গুরুজী’, মাঝে মাঝে আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলেন। আমার শরীরের গ্লানি আজ যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। জ্বর তো নেই, পায়ের ব্যথাও আর যেন অনুভব করছি না।।

হনুমান চটি থেকে বদরীনাথের পথের দুস্তর চড়াইয়ের কত না জনশ্রুতি। হয়তো দীর্ঘ পদযাত্রার শেষে শ্রান্ত, ক্লান্ত কষ্টভোগের শেষ মুহূর্তগুলি তীব্র হয়েই যাত্রীদের মনে জেগে থাকে। কিন্তু আজ আমার কোন কষ্টই হচ্ছে না।। বরং মনে হচ্ছে যাত্রীদের সেই বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তবে গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়ার পথ, হেমকুণ্ড-লোকপাল যাবার পথ, সত্যই কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য।

পথে দেখি গ্রাম্য মেয়ে পুরুষ গরুবাছুর চরাতে চলেছে। খচ্চরের দল মাল-পত্র পিঠে নিয়ে চলেছে, সঙ্গে আছে দেশীয় ব্যবসাদার। এদের মুখে তীব্বতী ভাব সুস্পষ্ট। এপথে উল্লেখযোগ্য দুটো চড়াই। একই পাহাড়ের তলা থেকে এঁকে-বেঁকে উঠতে হবে পাহাড়ের মাথায়। দ্বিতীয় চড়াইটার মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ঢিবির কাছে আসতেই দূরে বদরিকাশ্রম দেখা গেল। এখনও প্রায় মাইলখানেক। প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ কঠিন পার্বত্য উপত্যকার বাঁদিকে বিশাল পর্বতশ্রেণীর পায়ের কাছে একটি সমৃদ্ধ জনপদ। নানা আকৃতির বাড়ী-ঘর —গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে চলেছে অলকানন্দা।

আর একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার তৃপ্তিতে ভরে ওঠল। বহু যুগের বহু তীর্থকামীর ধ্যানের স্বর্গ এই বদরিকাশ্রম। বাল্যকাল থেকে কত শুনেছি, কত পড়েছি। মনের নিভৃতে কতই কল্পনা করেছি। আজ দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

এবার উৎরাইয়ের পথ, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বন্ধুর অসমান পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে যাই, ছবিও তুলি কয়েকটা। এখান থেকেই শহর আরম্ভ হয়েছে। বদরীনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,০৪৪ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া গাছের তলায় এসে ছায়ায় দাঁড়াই। বেশ বড় গাছ, অনেকটা আমাদের দেশের জাম গাছের মত। বৃক্ষ বলতে গোটা বদরিকাশ্রমে শুধু এই একটিই। এখানে নাকি আগে অনেক বদরি ফলের গাছ ছিল, সেই থেকেই নামের উৎপত্তি। বদরি মানে কুল।

প্রশস্ত চওড়া রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি। হাসপাতাল, ডাকবাংলো,

মাদ্রাজীদের ধর্মশালা ইত্যাদি ছাড়িয়ে অলকানন্দার ওপারে লোহার সেতু পার হয়ে ডাকঘর। বাড়ীতে একটা তার করে দিলাম। বেলা সওয়া এগারটা বেজেছে।

বদরিকাশ্রমের অন্য নাম নরনারায়ণাশ্রম। নারায়ণ পর্বতের পাদদেশে অলকানন্দার তীরে এই বদরিকাশ্রম। নদীর অপর পারে বিস্তীর্ণ উপত্যকাটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে নরপর্বত। এই দুই পর্বতের মাঝ দিয়ে নেমে আসছে অলকানন্দা—অলকাপুরী থেকে।

ডাকঘরের সামনে দিয়ে পাথরে বাধানো সঙ্কীর্ণ পথ চলে গেছে মন্দিরের দিকে। দু ধারে সারি সারি দোকান। প্রায় এক ফার্লং পথ এগিয়ে মন্দিরের পিছনে, অল্প উঁচুতে কালি কমলি ধর্মশালায় গিয়ে পরিচালকের সঙ্গে দেখা করলাম। জঙ্গবাহাদুরজীর পরিচয় পত্রটা পেশ করতে একখানা ঘর মিলল একতলায়। ঘরের মেঝেতে সতরঞ্চি পাতা। একটি মাত্র জানলা। খুলে দিতেই নদীর দু পাশের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে ক্যামেরা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি মন্দিরের দিকে। নির্মল আকাশ, প্রখর রোদের তেজ। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে কয়েকটা ছবি তুলি। এখন মূল-মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে, আবার দর্শন মিলবে বিকেলে। মন্দির সোপানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলি—নিজের স্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী করে রাখি ক্যামেরার মাধ্যমে।

ছবি তোলা শেষ করে ফিরে আসি ধর্মশালায়। কলের জলে মুখহাত ধুয়ে নিয়ে বাজারের পথে রওনা হই কিছু খাবার চেষ্টায়। বেলা একটা বেজে গেছে। অধিকাংশ দোকানই বন্ধ। মাত্র একটা হালুয়াইয়ের দোকান খোলা পেলাম। পুরি ও মালপোয়া দিয়ে দুপুরের আহার সমাধা করা গেল। তারপরে সেখানে বসেই কয়েকখানা চিঠি লিখে সেগুলোকে ডাকবাক্সে ফেলে আবার চলে আসি ধর্মশালায়।

এখানে সারাক্ষণ প্রবল ঠাণ্ডা ও শুকনো হাওয়া বয়। হাওয়ার মধ্যে কোথাও বসে থাকতে অথবা চলতে কষ্ট হয়। তবে ঘরের মধ্যে বা বন্ধ জায়গায় থাকলে কোন কষ্ট হয় না। এখানে এখন শীত খুবই প্রবল। আশেপাশের পাহাড়ে বরফ পড়তে শুরু হয়ে গেছে। ফলে যাত্রী সমাগম কমে গেছে, শহর ক্রমেই খালি হচ্ছে। দেওয়ালীর পরে সবাই নেমে যাবেন এখান থেকে। তারপরেই সারা শহর তুষারে ঢেকে যাবে। শীতকালে জোশীমঠে বদরীনাথের পূজা হয়।

ধর্মশালায় ফিরে ব্যাগ থেকে মা-র দেওয়া বৃন্দাবনের গেরুয়া ও গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মন্দিরের সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে তপ্তকুণ্ড। স্নানের ঘর আছে, বেশ বড় ঘর। উপরে টিনের আচ্ছাদন। পাথরের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। সিঁড়ির তলা দিয়ে নালার সাহায্যে কাছের তপ্তকুণ্ড থেকে গরম জল এই চৌবাচ্চার মধ্যে অবিরত পড়ছে। উদ্বৃত্ত জল অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে ১৫।২০ হাত নিচে আলকানন্দার জলে পড়ছে। একেবারে ফুটন্ত জল নয়, তাপ কিছু কম। অনেক স্নানার্থী। কেউ স্নান করছেন, কেউ স্নানের আগে পাণ্ডার কাছে মন্ত্রপাঠ করছেন। পূর্বপরিচিত পাঞ্জাবী মহিলারা বাইরের নলের কাছে কাপড় কাচছেন। গরম জামা-কাপড় একপাশে খুলে রেখে, গেরুয়া পরে আমিও নেমে পড়ি চৌবাচ্চায়। আরামে গা ডুবিয়ে দিই। শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। পায়ের যন্ত্রণাও সেরে যায়। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করি। সেই সঙ্গে উপভোগ করি দেহাতী তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে পাণ্ডাদের নগদ পয়সা রোজগারের কায়দাগুলো।

স্নান শেষে নতুন উৎসাহ ফিরে পাই। ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরের সামনের লোহার সেতু পার হয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যাই। বদরীনাথের মন্দিরের বাপাশে অল্পদূরে নারায়ণ-পর্বতের পেছনে বিখ্যাত নীলকণ্ঠ পর্বত। মেঘে ঢাকা নীলকণ্ঠের ছবি তুলতে চেষ্টা করি, ভাল হয় না। যেন মেঘের ফাঁক দিয়ে নীলকণ্ঠ আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলছে। এই পিরামিড আকৃতির গিরি-শৃঙ্গ সৌন্দর্যে ও স্বকীয় বৈশিষ্টে পৃথিবীর সেরা পর্বতারোহীদের হৃদয় জয় করেছে। অপরূপ সুন্দর, মহিমময় সম্ভ্রান্ত গঠন, দর্শনমাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। অপরাহ্নের পড়ন্ত বেলার অল্প আলোতে মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় শুধু শিখরটি। অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে পড়ে—ফ্রাঙ্ক স্মাইথের বর্ণনা। ১৯৩৭ সালে তাঁর নীলকণ্ঠ অভিযানের সময় লেখা, "Only one great mountain is visible from Badrinath, Nilkanta. This peak is associated in Hindu Mysticism and Mythology with Siva, for Nilkanta or Nilkantha, the Blue-necked, is an allusion to the God whose matted locks are represented by the torn glaciers and eternal snows. It is easy to understand why Nilkanta should be held in superstitious awe and

reverence by the pilgrims, for there is no more majestic and awe-inspiring peak of its height in the world. It rises 21,640 feet above the sea and its summit is only five miles from Badrinath...... It has no rival within eight miles, and is beautifully proportioned, being pyramidal in form with a graceful ice-clad summit......

নারায়ণ পর্বত যেন নীলকণ্ঠের নিচে দু ভাগ হয়ে গেছে। আর তার মাঝখান দিয়ে একটা বড় ঝরণা বহু উচ্চস্থান থেকে নেমে এসে বদরীনাথের অলকানন্দায় পড়ছে। লালরংয়ের মন্দিরের সোনার চূড়াগুলো গোধূলির রোদে জ্বলছে। আমার ছবি তোলার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বিকেলের সূর্য আমার ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায়।

অলকানন্দার দুই তীরের নর ও নারায়ণ পর্বত। ঈষৎ তাম্রাভ বর্ণের (Brownish rock) রুক্ষপাথরের পাহাড়গুলোর গায়ে অল্প ঘাস ও গুল্মজাতীয় আগাছা। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ জমা হতে শুরু হয়েছে। অলকানন্দার তীর দিয়ে মানা গ্রামের পায়ে-চলা পথ। স্বর্গারোহিণীর পথের গোড়াতেই চারিদিকের অপূর্ব বর্ণসুষমায় মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়, দেয় সবকিছু ভুলিয়ে। চারিপাশে তামাটে রংয়ের পাহাড়, তাদের মাথায় বরফের চূড়া, বাঁদিকে সগর্বে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ. উপরে নীল আকাশ, তার মধ্য দিয়ে সশব্দে নিচে বয়ে চলেছে ঘন নীল অলকানন্দা। মর্তের মানুষের সব আশা, আকাঙ্খা ও ভোগের চিন্তা গুলিয়ে দিয়ে, কে যেন সবলে আকর্ষণ করে অলকাপুরীর দিকে। আরও সুন্দর, আরও ঐশ্বর্যে ভরা মহাপ্রস্থানের পথে—।

সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার আগেই ফিরে আসি এপারে, মন্দিরের দিকে। পুলের ওপর থেকে দেখি পাশেই অল্প নিচে তপ্তকুণ্ডের জল এসে পড়ছে অলকানন্দায়। অল্প দূরে নদীর গর্ভে একখণ্ড বড় পাথর, আকৃতি একটা বড় পাখীর মুখের মত। শুনেছি ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখীর মূর্তি এটি।

এবারে মন্দিরে আসি খালি পায়ে। ক্যামেরা থাকে বাইরে ঘুরবাহাদুরের জিম্মায়। তোরণ পার হয়ে ভেতরে প্রশস্ত উঠোন। মাঝখানে একটি পাথরের মন্দির। ভিতরে ঢুকে প্রদীপের স্বল্প আলোয় নানা সাজ সজ্জায় প্রায় ঢাকা বিগ্রহ দর্শন করে প্রণামী দেই, সামনে রাখা রূপার প্রকাণ্ড পাত্রের মধ্যে। অঞ্জলি ভরে নির্মাল্য দেয় পূজারী—পূজার ফুল, কাঁচা ডাল, কলাই ইত্যাদি

একত্রে মেশানো। প্রসাদের জন্য উঠোনের একপাশে দপ্তরে গিয়ে দাঁড়াই। দপ্তরের বারান্দায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায় পুরোহিতরা বসে আছেন এবং দেহাতী যাত্রীদের সঙ্গে পূজার খরচ নিয়ে দর ঠিক করছেন। আগের দিন এই দপ্তরে টাকা জমা দিলে, পরদিন পূজা ও সঙ্কল্প হয় এবং বেলা এগারোটায় ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায়। ছোট ছোট তিনটি কাগজের পুরিয়ায় প্রসাদ সংগ্রহ করে বিদায় নিলাম মন্দির থেকে।

মন্দিরের তোরণ ও বাইরের দেওয়ালে নানারংয়ের ইলেকট্রিক লাইটের বাল্ব দিয়ে সাজানো—বিয়েবাড়ীর মত। শুনলাম একটা ডিজেল ইঞ্জিন থেকে বিজলী সরবরাহ হয় মন্দিরে। এই প্রাচীন হিন্দু তীর্থের মন্দিরে বিজলী বাতি কেমন যেন বিসদৃশ লাগে

মন্দিরের পাশ থেকেই শুরু হয়েছে বাজার। সরু বাধানো রাস্তার দু ধারে সারি সারি ছোট ছোট দোকান। কোনটিতে চাল ডাল, আটা থেকে শুকনো মেওয়া বাদাম ইত্যাদি, কোনটায় মনিহারী জিনিসপত্র আবার কোনটিতে ছবি ও ধর্মপুস্তক। আর আছে তামার এবং রূপার পাতের তৈরী বদরীনাথের বিগ্রহের দোকান। একটা বড় দোকানে চামর, শিলাজিৎ প্রভৃতি পাওয়া যায়। নানাপ্রকারের কবিরাজি ঔষধপত্রও আছে এই দোকানে। চামর, শিলাজিৎ এসেছে নেপাল থেকে। দোকানদার অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক। আলমোড়া জেলার কাপকোটে তাঁর বাড়ী। শিলাজিৎ সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তবু দু টাকায় কিনে নিলাম চার ভরি। শিলাজিৎ বা শিলাজতু হচ্ছে শৈলঘাম। একরকমের পাহাড়ের গায়ে পাথরের মধ্যে কালো আঠার মত চটচটে এ বস্তুটি আপনি জন্মায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এটি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ বলবর্ধক এবং শরীর গরম রাখে বলে এর প্রসিদ্ধি। কালিদাসের অমর রচনাতেও এর উল্লেখ আছে 'মনঃশিলা' বা 'শৈলরস' বলে। অনেকক্ষণ বসে গল্প করলাম তাঁর সঙ্গে। দেখলাম সম্ভ্রান্ত নেপালী তীর্থযাত্রিণীদের তামার ও রূপার পা..র বিগ্রহের ছবি কেনা। গুটি তিনেক মহিলা বাজারটা প্রায় খালি করে দিলেন।

অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ঠাণ্ডায় দোকানে বসে থাকতে বেশ কষ্ট হয়। রাতের খাবার জন্য ঘুরবাহাদুরকে একটা টাকা বকশিশ করে ফিরে আসি ধর্মশালায়। আজ একদল ধনী গুজরাতী তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয়েছে এখানে। ব্যস্ত ভাবে তাদের ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি মন্দিরের দিকে।

ধর্মশালার একতলায় আমি একা, দোতলায় একজন বৃদ্ধা মাদ্রাজী মহিলা আছেন।

॥ ১৩ ॥

ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজে পাতলা ঘুমটা ভেঙে গেল। পথচারী ভেড়ার পালের গলায় বাঁধা ঘণ্টাধ্বনি। ঘড়ি দেখি, ভোর সাড়ে পাঁচটা। আজ ৫ই অক্টোবর। কম্বলের তলায় গুটিশুটি দিয়ে বদরিকাশ্রমের ধর্মশালার ছোট ঘরটাতে শুয়ে আছি। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। একে প্রচণ্ড শীত তার সঙ্গে পাহাড়ী খাবার দোকানের মোটা আধকাঁচা রুটিগুলো পেটের মধ্যে সারারাত বিশেষ গোলমাল করেছে।

জানলাটা অল্প খুলে ভোরের আলোয় চারিদিকের শোভা দেখি রোদ উঠতে এখনও অনেক দেরী আছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপটে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। মুখ হাত ধুয়ে নিজের ঘরেই এক কেটলী গরম জল আনিয়ে, বাদাম বিস্কুট ও জ্যাম সহযোগে চা খেয়ে নিই। তারপরে বেরিয়ে পড়ি পথে, উদ্দেশ্য ছবি তোলা। বেলা আটটা বেজেছে, নর-পর্বতের মাথার ওপর দিয়ে সকালের সূর্য সবে দেখা দিয়েছে, "আলোকের অবতরণিকা পূর্ব আকাশে।"

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই উপত্যকায় সকালের রোদ পৌছতে বেশ দেরী হয়। মন্দিরের সামনের সেতু পার হয়ে অলকানন্দার অপর তীরের খোলা ময়দানে আসি। স্থান নির্বাচন করে নিয়ে ছবি তোলা শুরু হয়। ক্যামেরাটায় রঙীন ছবি ভরা আছে, মনের সাধে চারিদিকের ছবি তুলতে আরম্ভ করি। অলকাপুরীর অপরূপ শোভা আমার ছবির মধ্যে ধরে নিয়ে ঘরে ফিরব। রঙীন ছবি তোলা সাঙ্গ করে এবারে ক্যামেরা খুলে ফেলে সাদা-কালো ছবি ভরে নিই। নীলকণ্ঠের দিকে ক্যামেরা ফিরিয়ে ছবি তোলা আরম্ভ করতে গিয়ে দেখি ক্যামেরার পরদাটা (shutter) কাজ করছে না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় এরকম হয় জানি। ক্যামেরাটা আবার খুলে ফেলে জটিল যন্ত্রপাতিগুলো সক্রিয় করতে চেষ্টা করি, সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে মাথায়। হালকা থাকব বলে মাত্র একটা ক্যামেরা এনেছি এবারে। কাজেই ক্যামেরা খারাপ হয়ে যাওয়ার অর্থ অন্ধ হওয়া। আকস্মিক বজ্রাঘাতের মত এই বিপত্তিতে স্তব্ধ হয়ে যাই। নির্মল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে রুপোলী আলোয় ঝলমল করে নীলকণ্ঠ

অপরূপ ভঙ্গিমায় যেন আমায় উপহাস করছে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে ছেদ নেমে আসে।

একটা দোকান থেকে পুরি ও মেঠাই খেয়ে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করলাম বেলা এগারোটায়। ঘুরবাহাদুরকে বলে দিলাম ধর্মশালা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আমার পিছনে আসতে। আজ আকাশ একেবারে নির্মল, প্রচুর রোদ, নীল-কণ্ঠের শীর্ষদেশ একেবারে পরিষ্কার—বুকের নীল দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। ঐখানটায় পাথরের গঠন এত মসৃন ও ঋজু যে বরফ দাঁড়াতে পারে না। দূর থেকে মনে হয়, সমুদ্রমন্থনের হলাহল পান করে কণ্ঠে ধারণ করেছেন মহাদেব। বিশ্বের অনিবার্য ধ্বংস রোধ করেন প্রলয়ের দেবতা!

চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্য, অলকানন্দার ঘন নীল জল, যতই দেখি, মন ভেঙ্গে পড়তে চায় হতাশায়—নিরুপায় দুঃখে। কাঁধের অকেজো ক্যামেরাটা অনর্থক বোঝার মত মনে হচ্ছে।

বদরিকাশ্রম থেকে প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে, পথের ধারে একটা পরিত্যক্ত কুটীরের দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করি ঘুরবাহাদুরের জন্য। দরজায় তালা দেওয়া ছোট ঘরটা দেখে মনে হয় একটা ছোট চায়ের দোকান একপাশে, অন্যপাশে দোকানীর অস্থায়ী সংসার। যাত্রীসমাগমের কয়েকটা মাস দরিদ্র গ্রামবাসীর সারা বছরের অন্নসংস্থানের দীন প্রয়াস। গাড়োয়ালের এইসব দুর্গম অঞ্চলে বহুকষ্টে, বহুপরিশ্রমে উৎপন্ন হয় শুধুমাত্র কিছু রামদানা। সামান্য কয়েকটা মাস মাত্র। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্পকাল চলে চাষ ও তীর্থযাত্রী সমাগম। এছাড়া রোজগারের আর কোন উপায় নেই। সম্প্রতি রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে কিছু উপার্জন হচ্ছে। অতি দরিদ্র এই পাহাড়ীদের জীবনের সামান্য প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয় উপার্জনের পথ। কোন শিল্প গড়ে ওঠেনি হিমালয়ের এইসব অঞ্চলে। প্রচণ্ড শীত আর প্রকৃতির নিরন্তর ধ্বংসলীলার সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট শক্তি এদের অবশিষ্ট নেই। কিন্তু পরম নির্বিকার চিত্তে, দারিদ্র্য আর অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে এই গাড়োয়ালীরা, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের যোগ্য শিষ্যের মত। নির্লজ্জ ভিক্ষুকের মত চাইতে দেখি এদের। সামান্য জিনিস, প্রয়োজনের সময় সুযোগ বুঝে দশগুণ দাম হাঁকে এরা যাত্রীদের কাছে। কিন্তু কখনও কোন অরক্ষিত জিনিসপত্র বা অর্থ চুরি করতে দেখিনি এদের—শুনিওনি। অদ্ভুত এদের নীতিবোধ!

বহুক্ষণ এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করছি। ঘুরবাহাদুরের দেখা নেই। বিরক্তিজনক এই লোকটার ব্যবহার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেছে. দীর্ঘ বার মাইল পথ আজ পাড়ি দিতে হবে। আবার বদরিকাশ্রমের দিকে ফিরে যেতে মন চায় না। কুলির চিন্তা ছেড়ে, আশে-পাশে দৃশ্যের মধ্যে মনকে আবার ডুবিয়ে দিই। এই প্রান্তরের অনেকটা নিচে দিয়ে অলকানন্দা বয়ে চলেছে একটা সরু ফিতের মত। তার ওপাশের উঁচু পাহাডগুলোর গায়ে চরে বেডাচ্ছে গরু, ভেডা ও ছাগল। বিশেষ কায়দায় খাড়া পাহাড়ের গায়ে উঠে সামান্য ঘাসটুকু ছিঁড়ে খায় ওরা। পাহাড়ের গায়ে আল্‌সের মত ছোট্ট খাঁজের মধ্যে দু-একটা ছোট ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে ওদের পাহারায়। এপারের পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙ্গা হয়, অল্পসময় অপেক্ষা করে কুলিরা সেই ভাঙ্গা পাথর ও মাটির স্তূপ সরিয়ে পাহাড়ের বুকে নূতন পথ সৃষ্টি করে। ঘোড়ায় চড়ে একজন ঠিকাদার পরিদর্শন করে গেলেন কিছু আগে। বদরীনাথ পর্যন্ত মোটরের রাস্তা তৈরী হতে আর দেরী নেই। অশক্ত বৃদ্ধেরা এবারে পারবেন সহজেই এপথে আসতে। কিন্তু আমার জন্যে হাঁটাপথই ভালো। বসে আছি পথের পাশে, ফিরতি পথের দু চার জন যাত্রী আসেন কখনও। কেউ হেঁটে, কেউ কাণ্ডীতে, কেউ বা ডাণ্ডীতে চড়ে। কুলির পিঠে বাঁধা ছোট্ট বেতের চেয়ারের নাম 'কাণ্ডী'। একখানা কাঠের হেলান চেয়ারকে দুটো লম্বা কাঠ দিয়ে বেঁধে চারজন বাহক পাল্কীর মত বয়ে নিয়ে চলেছে, এই হল 'ডাণ্ডী'।

বসে বসে ভাবছি— ভাঙ্গা ক্যামেরাটা নিয়ে বিরহীগঙ্গার দিকে যাওয়া স্থগিত রাখব কিনা। পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মত আগামী ৯ই তারিখে, কলকাতা থেকে নির্মলদা আসছেন সপরিবারে, চামোলী থেকে একসঙ্গে আমরা যাবো গোহনায়। আমায় না দেখে কি ভাববেন তাঁরা! এলোমেলো চিন্তায় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রচুর ফিল্‌ম সঙ্গে রয়েছে অথচ ক্যামেরা অকেজো। গুলি রয়েছে প্রচুর কিন্তু বন্দুক গিয়েছে ভেঙ্গে।

দুঘন্টা এক জায়গায় অপেক্ষা করে বেলা একটার পরে মূর্তিমান কুলিটার দেখা পেলাম। শুনলাম আজ সকালে আমার চলে আসার পরে বদরিকাশ্রমে অন্যলোকের মালপত্র বহন করে কিছু রোজগার করছিল। মৃদু ভৎসনা করে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলি। ঘন্টায় ২।৩ মাইল চলতে না পারলে সন্ধ্যার আগে

গোবিন্দঘাট পৌঁছন যাবে না। সেখানে ডাকবাংলোতে আজ আমার খাওয়ার ও থাকবার ব্যবস্থা আছে।

একটা পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নামছি, দেখি নিচে থেকে উঠছেন একজন মহিলা, পরনে আঁটসাঁট প্যান্ট (Slack) ও বুকখোলা শার্ট। মাথায় টুপি, চোখে রঙীন চশমা। দুহাতে দুটো লাঠি নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠছেন। একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে অল্পদূরে অপেক্ষা করছেন আরও দুজন স্ত্রীলোক। কাছে আসতে, দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করেন মহিলাটি। বদরীনাথের দূরত্ব জানতে চান। শুনলাম কলকাতা থেকে আসছেন তাঁরা। পেছনে আসছেন তাঁর স্বামী, কলকাতার কাছে এক কারখানার ডাক্তার। সুন্দর ইংরাজিতে কথা বলছেন আধুনিকা যুবতীটি। ওঁদের দেশ মিথিলায়। একটু হেসে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে নেমে চলি নিজের পথে।

অলকানন্দার সেতু পার হয়ে, নদীর বাঁক ঘুরে হনুমান চটিতে এসে পড়ি। এখানে নদীর চওড়া গর্ভের দুই কিনারে পাথরের নানা রংয়ের নুড়িগুলোতে রোদ পড়ে চিক্‌মিক্ করছে। ছবি নেওয়া হল না এমন সুন্দর দৃশ্যের— ক্ষোভে ও দুঃখে ভরে ওঠে মন।

হনুমান চটির লালার দোকানে এক গেলাস চা ও দুটো লাড্ডু খেয়ে আবার চলা শুরু। এখন বেলা দুটো বেজে পঞ্চাশ। এখানে থেমেছি মাত্র পনের মিনিট। আরও সাত মাইল পথ যেতে হবে সন্ধ্যার আগে। অজানা পাহাড় জঙ্গলে একা পথ চলতে নানা অসুবিধা। তাছাড়া এ অঞ্চলে ভালুকের অত্যাচারের কথা অনেক শুনেছি সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্য হয়নি। স্থানীয় লোকেরা ভালুককে বলে 'রিখি' (দেব ভাষায়—ঋক্ষ্য)। বাঘও শুনি মাঝে মাঝে দেখা যায়। আমার সঙ্গে অস্ত্র বলতে আছে রুইস গাছের সরু একটা ছড়ি। মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে যখন কুমায়ুনের বিখ্যাত স্থান কৌশানীতে বেড়াতে যাই আশ্বিনের শেষে, নাইনিতাল ও আলমোড়ার সরকারী কর্মচারীরা (Tourist Bureau) আমায় সাবধান করে বলেছিলেন যে শীতের প্রারম্ভে কৌশানী অঞ্চলে ভালুকের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা দরকার। আমার কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখিয়ে বলেছিলাম—এই দিয়ে স্যুট্ করবো (Shooting), কোন ভয় নেই। কিন্তু আমার সে সুযোগ হয়নি। ভদ্রলোকদের দেখা পাইনি। চৌকিদারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাত চারটে

থেকে ডাকবাংলোর সামনে চৌড় বনে দাঁড়িয়ে কৌশানীর বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখেছি।

একমনে পায়ের দিকে নজর রেখে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে চলেছি। বিকেল সওয়া চারটায় লাম্‌বগড় চটিতে এলাম। না থেমে এগিয়ে যাই। এখনও চার মাইল পথ অবশিষ্ট আছে, সন্ধ্যা হতে আর মাত্র ঘণ্টা দেড়েক দেরী। মাইল খানেক এগিয়েছি, দেখি একজন লোক আসছে উল্টো দিক থেকে, একটা পোঁট্‌লা ঘাড়ে নিয়ে। পরনে ঢিলা পায়জামা ও তার ওপরে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে আধময়লা ধুতি, গায়ে একটা জীর্ণ কোট। পায়জামার তলা ও কোঁচার নিচের অংশ মাটিতে লোটাচ্ছে। কাদা মেখে ছিঁড়েও গেছে। শ্যামবর্ণ লম্বাটে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। কাছে আসতে বড বড় চোখ মেলে সে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করল আমাকে—জোশীমঠ আর কতদূর! জোশীমঠ থেকেই আসছে সে। বুঝলাম হেড অফিসে গোলমাল! পরিষ্কার বাংলায় বললাম—কোথায় যাওয়া হচ্ছে? উত্তরে হেসে বললে, 'বাবা টেনেছেন'। বললাম, বদরীনাথ এখান থেকে আট মাইল আজ সেখানে পৌঁছন সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, কলকাতায় বাড়ী, ক্যালকাটা ইলেকৃট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর মেটিয়াবুরুজ পাওয়ার হাউসে কাজ করত। চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলেছে বাবার টানে! ওর কর্মস্থানে আমার বিশিষ্ট বন্ধুর নাম করলাম, কিন্তু চিনতে পারল না। পরিচয়ের পালা বোধকরি শেষ হয়ে গেছে ওর জীবনে। মনে পড়ল এর কথা কলকাতায় শুনেছিলাম আমার বন্ধুর কাছে, উচ্চশিক্ষিত ছেলেটি। পরে ছেলেটির সহকর্মীদের কাছে শুনেছি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই ছেলেটি একটি মাদ্রাজী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে সংসার থেকে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু অল্পদিন পরেই মাদ্রাজী মেয়েটির আকস্মিক মৃত্যুতে বেচারার মাথা খারাপ হয়েছে। সামনের লাম্‌বগড় চটিতে রাত কাটাবার পরামর্শ দিয়ে ওর কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। বেচারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। একটা সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের করুণ পরিণতি!

বিনায়ক চটি ছাড়িয়ে আরও দেড় মাইল পথ একভাবে চলে বেলা ৫৷১০ মিনিটে পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর মাত্র একমাইল পথ অবশিষ্ট আছে। পুলিস-চৌকীর সামনের দোকানে বসে এক গ্লাস জল পান করে চায়ের ফরমাশ করি। ফাঁড়ী থেকে জমাদারজী বেরিয়ে এলেন। শুধোলেন আমার যাত্রার খবর, শরীরের অবস্থা আর কুলির ব্যবহার। হেসে

বললাম সবই ভালো শুধু আজই সে একটু দেরী করছে। উত্তর প্রদেশের পুলিস কর্মচারীদের সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি এ পথের সর্বত্র। সিপাহিজীর শুক্‌নো মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার কি হয়েছে। বললে 'পেচিস্ কা সাথ খুন গিরতা হ্যায়, বোখার ভি সাথ মে হ্যায়' অর্থাৎ রক্ত আমাশয় হয়েছে। সরকারী চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডারটি কাছেই ছিলেন, বললেন ওষুধ দিয়েছেন, সারতে সময় লাগবে। এই সময় ঘূরবাহাদুর এসে পড়ায়, ব্যাগ থেকে আরও ভাল ওষুধ দিলাম তাঁকে। আমার এই সামান্য সৌজন্যে অতিমাত্রায় প্রীত হয়ে, নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যোগবদরী মন্দির পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে সঙ্গে হাবিলদারকে পাঠালেন গোবিন্দঘাট পৌঁছে দিতে। সন্ধ্যা ছয়টায় আনন্দসিংয়ের হাসিমুখ দেখলাম গোবিন্দঘাট ডাকবাংলোতে। সে আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তার কাঁধে হাত রেখে ঘরে এসে ঢুকি।

সবেমাত্র জামা কাপড় বদলিয়ে মুখহাত ধোবার উদ্যোগ করছি, এমনি সময় দরজায় করাঘাত শুনে, বেরিয়ে দেখি আধুনিক সাজে সজ্জিত কয়েকটি ভ্রমণকারী যুবক, আমার অনুমতি চাইছে পাশের ঘরটি দখল করবার জন্য। চৌকিদারকে দেখিয়ে দিলাম, পাশের ঘরে তাঁদেরও স্থান মিললো।

অনেক জিনিসপত্র, চাকর, পাচক ইত্যাদি নিয়ে দিল্লী ইউনিভার্সিটির জনাদশেক ছাত্র ও দুজন অধ্যাপক চলেছেন নন্দনকাননের পথে। উদ্দেশ্য ভ্রমণ, নৈসর্গিক শোভা দর্শন এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণা। ওদের প্রস্তুতিটি একেবারে আধুনিক। তবে লটবহর ও প্রচুর লোকলস্কর নিয়ে চলেছে পায়ে হেঁটে বেড়াতে (Hiking)। সঙ্গে একটি ব্যাটারীচালিত বেতার যন্ত্রও আছে। মনে মনে ভাবি, বাঙলাদেশের শিক্ষাবিভাগ বোধহয় এবিষয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছেন। যদিও দেখেছি দার্জিলিঙ জেলার পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার ও থাকবার সুব্যবস্থা করেছেন আমাদের সরকার। 'ইউথ হোস্টেল' (Youth Hostel) আছে দার্জিলিঙ, মণিভঞ্জন, সান্‌ডাকফু, ফালুট প্রভৃতি স্থানে। কিন্তু সেই সব স্থানে বেড়াতে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি করবার দায়ীত্ব কি নিয়েছেন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি? ছাত্রজীবনের ছুটির দিনগুলো এমনিভাবে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট করা, পাহাড়, জঙ্গল, নদীপথ ধরে চলবার অভ্যাস ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করা, মনে হয় পাঠ্য-বিষয়ের তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। তবে সেই সঙ্গে বাহুল্য ও বিলাসিতা অবশ্যই

বর্জন করা উচিত। এদের দেখে মনে হচ্ছে বিলাসিতার দিকেই বেশী ঝোঁক।

প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করি। চৌকিদারপুত্র আনন্দ সিং স্বহস্তে প্রস্তুত করছে আমার খাবার। রাত আটটায় আনন্দ সিং আমার ঘরে নিয়ে আসে খিচুড়ী ও তার সঙ্গে কিছু কাঁচা টমাটোর টুক্‌রা। পাশে বসে সযত্নে আমায় খাওয়াতে খাওয়াতে সুখদুঃখের কথা বলে আনন্দ সিং। তার সৈন্য জীবনের কাহিনী, তাদের সংসারের কথা। চাকুরীতে স্বল্প আয়ের জন্য এখনও সে অবিবাহিত। বলে—শান্তির সময়ে সৈন্যবিভাগে অতি অল্প বেতন এবং পদোন্নতিও হয় অতি ধীরে। বর্তমান দুর্মূল্যের সময় সংসার চালানো কষ্টকর। কাজেই উপার্জন বাড়াতে না পারলে সে বিয়ে করতে পারবে না। তাই সে আরও বেশী আয় করতে চায়। বুঝি তার কথা, কিন্তু এর প্রতি-বিধানের কোনও সন্তোষজনক উপায় আমার জানা নেই।

বিছানায় শুয়ে পাশের ঘরের বেতার যন্ত্রে বিলাতী গান শুনি—অলকানন্দা আজ আমার সঙ্গে আড়ি করেছে, তার সঙ্গীত গেছে হারিয়ে।

॥ ১৪ ॥

গোবিন্দঘাট ডাক বাংলো। ঘুম ভাঙলো সকাল ছটায়। বাইরে বেরিয়ে ডাক-বাংলোর বাগানে পায়চারী করি অনেকক্ষণ। অজস্র কস্‌মস্‌ ও মেরিগোল্ড (গাঁদা) ফুটে আছে বাগানে। চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, বাদিকে বরফের চূড়া। ডানদিকে শিখগুরুদ্বারার পাশ দিয়ে অলকানন্দার সেতু পার হয়ে হেমকুণ্ড-নন্দনকাননের পথ। আমার ঐ পথ-পরিক্রমা পূর্ণ হয়েছে। ডাক-বাংলোর অল্প নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে নীল জলধারা—অলকানন্দা। অতি শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ। নিরিবিলি এই জায়গাটা আমার হৃদয় জয় করেছে। কিছুদিন শুধুই বিশ্রাম করবার আদর্শ স্থান গোবিন্দঘাট। আমিও স্বল্প অবকাশের সময়টুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছি।

সকাল নটায় ছাত্র-ভ্রমণকারী দল নন্দনকাননের পথে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক গল্প করেছি। পথের অভিজ্ঞতার কথা যথাসাধ্য তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি। ওরা চলে যাবার পরে ভাঙ্গা ক্যামেরটা মেরামত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিফল চেষ্টা। সফলই বা হব কেমন করে? যন্ত্রপাতি বলতে তো আনন্দ সিংয়ের একখানা মরচে ধরা ছ-ফলা ছুরি।

গোবিন্দঘাট ত্যাগ করলাম বেলা পৌনে এগারটায়। একেবারে নির্মল আকাশ, চারিদিকে প্রখর রোদ। জোশীমঠের পূর্বপরিচিত রেঞ্জ অফিসার পুরোহিতজীর সঙ্গে দেখা হল। তিনিও জোশীমঠ চলেছেন। পুরোহিতজীর পায়ের হাঁটুতে বাতের যন্ত্রণা। আমার পায়ের অবস্থাও তদ্রূপ, তবে অসুখে নয়—অত্যাচারে। দুই সমব্যথী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি। কিছুদূর চলি, পথের ধারে গাছের ছায়া পেলে সেখানে একটু বসে গায়ের ঘাম মুছি ও পায়ের ব্যথা সারাই, আবার চলি। এমনি করে বিষ্ণুপ্রয়াগে আসতে বেলা দুটো বাজল। পথে ঘাট চটিতে চা, পকৌড়া ও লাড্ডু খেয়েছিলাম। এবার ধৌলীগঙ্গার ওপর দিয়ে সেতু পার হয়ে দুহাজার ফুটের খাড়া চড়াই। যাবার সময় দেখেছিলাম অনবরত পাথর ও মাটির ধস নামছে এখানে। সৌভাগ্যক্রমে আজ আর পাথর পড়ছে না।

লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়তে সওয়া ঘন্টায় কোন রকমে সেই চড়াই পেরিয়ে জোশীমঠে পৌঁছলাম। আগেই বাজারের একটা মেঠাইয়ের দোকানে ঢকে এক পোয়া গরম রসগোল্লা সেবন করে একটু ধাতস্থ হলাম। তারপরে ধীরে ধীরে বিড়লা হাউসে এসে ঢুকলাম। আজ এখানে অনেক লোকজন। বিড়লাদের আত্মীয় এক সম্ভ্রান্ত মারোয়াড়ী পরিবার পুরো দোতলাটা দখল করেছেন। উচ্চপদস্থ একজন পুলিস অফিসার সদলবলে এখানে এসেছেন সরকারী কাজে। তিনি একতলার একদিকটা দখল করেছেন। অন্যদিকের একটা ঘরে আমার স্থান মিলল পুলিস সাহেবের কেরানীর সঙ্গে। শুনলাম ওঁরা আগামীকাল প্রত্যুষে চলেছেন বদরীনাথের উপরে মানা অভিমুখে।

মুখহাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলিয়ে আবার বাজারে চলি। পথে দেখা হল লোহানীর সঙ্গে—স্থানীয় টেলিফোন অফিসের কর্মচারী। লোহানী আমায় নিমন্ত্রণ করেছে সামনের বছরে পিণ্ডারী হিমবাহতে যাবার জন্য।

বাজার থেকে সেরখানেক আপেল ও নাসপাতি আর কিছু মিষ্টি কিনে মজুদ করা গেল। জোশীমঠে আপেল, নাসপাতী, চেরী প্রভৃতি ফলের চাষ হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। রাণীক্ষেত থেকে এইসব ফলের গাছ সংগ্রহ করা হয়েছে, আবহাওয়া ও মাটির গুণে এখানে ফলন মন্দ হয়নি। ভাদ্রমাসে এখানে আপেলের দাম ছিল প্রতি সের আট আনা, নাসপাতি ছ আনা। এখন দেড়টাকা হয়েছে। ফলের মরসুম এখন আর নেই।

অনেক খুঁজে, সিংধারাতে একটি অতি নোংরা হোটেলে মাংস ও ভাত

পাওয়া গেল। আধসেদ্ধ, বড় বড় টুকরো মাংস আর জলের মত ঝোল ভাত দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলাম। হাজার হলেও দুসপ্তাহ বাদে কিছু প্রোটিন পাওয়া গেছে, এই ভাগ্য। তার স্বাদ গন্ধের গুণাগুণ বাছবার সৎসাহস আর নেই। হোটেলওয়ালার কাছে 'মীট' প্রায়ই থাকে, তবে যাত্রীদের কাছে সহজে প্রকাশ করে না। কারণ অধিকাংশ তীর্থযাত্রী দোকানে আমিষ রান্না হয়েছে শুনলে, আর সেখানে খাবে না। কাজেই গরীব দোকানদাররা খদ্দের দেখেশুনে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে মাংস বের করে। তিনটি পাহাড়ী যুবকও আমার সঙ্গে মাংস ভাত খেল। ওরা তপোবনের কাছে থাকে। শুনেছি তপোবন থেকে ঋষি গঙ্গার (Rishi Gorge) দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর।

একটি ছোট ছেলে আমাকে খাড়া পাকদণ্ডী পথে বিড়লা হাউসে পৌঁছে দিল। পাহাড়ের গায়ে তৈরী জোশীমঠে দুটি মাত্র মোটর চলাচলের রাস্তা, তাছাড়া আর প্রায় সবই এই পাকদণ্ডী, অন্ধকার ও খানাখন্দে ভর্তি। আশ্বিনের নির্মল সন্ধ্যাকাশ তারায় ঝলমল করছে। একফালি চাঁদের সামান্য আলোতে দেখি অলকানন্দার ওপারের উন্নত পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কোথায় ঢাক বাজছে। মনে পড়ছে দেশের বাড়ীর দুর্গা পূজার কথা—প্রতিবার পূজার সময় গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছি। জলপথে শহর থেকে ১৮ মাইল। বর্ষার শেষ, খাল বিল পূর্ণ। আমাদের গ্রামের কাছে নদীর প্রসার প্রায় একমাইল। সেবারে ঠিক সন্ধ্যার সময় গ্রামের সামনে পৌঁছল আমাদের নৌকা। কিন্তু মাঝিরা বহু চেষ্টা করেও কিছুতেই নৌকা ঘাটে ভেড়াতে পারল না। ঘাট থেকে প্রায় সিকি মাইল বড় বড় কচুরী পানার জঙ্গল। সারারাত নৌকার মধ্যেই কাটাতে বাধ্য হই। বাড়ী থেকে ঢাকের আওয়াজ কানে ভেসে আসে। নিরুপায় হয়ে দুঃখিত মনে সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নৌকার মধ্যে।

আজ জোশীমঠে ঢাকের আওয়াজ শুনে বাল্যের স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে। বুকটা ভারী হয়ে যায়। কোথায় আমার সেই দেশের বাড়ী আর কোথায় আমি!

ঘরে এসে লণ্ঠনের আলোয় নিত্যকার মত ডায়েরী লিখে শুয়ে পড়ি। সারা শরীরে পাকা ফোড়ার মত ব্যথা। আগামীকাল দীর্ঘ কুড়ি মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। পাশের খাটিয়ার কেরানীবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি রাত নটার পরে।

ঘুম ভাঙল ভোর ছটায়। পাশের খাটিয়ার ভদ্রলোকটি বিদায় নিলেন। ধীরে সুস্থে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে খানিকটা গরম জল সংগ্রহ ক'রে কফি, বাদাম, বিস্কুট, জাম ও মিষ্টি সহযোগে প্রাতরাশ করা গেল। বিড়লা হাউসের ম্যানেজার পাণ্ডেজীর কাছে বিদায় নিয়ে জোশীমঠ ছাড়লাম বেলা সাড়ে আটটায়। শিশির ভেজা পথে সকালের মিষ্টি রোদে পথের দু'পাশের ওক, চীড ও ঝাউগাছের শ্রেণী। মাঝে মাঝে ভেড়া ও ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে মেষপালক ও প্রকাণ্ড চেহারার তিব্বতী মাস্টিফ্ জাতীয় কুকুর। এই কুকুরগুলোর চেহারা ভীষণ, কিন্তু বেশ শান্ত প্রকৃতির। 'শপাঁচেক ভেড়া ও ছাগলের এক একটা পালকে দু তিনটি কুকুর দলবদ্ধ করে নিয়ে চলেছে প্রহরীর মত।

প্রায় সমতল পথ। দ্রুত এগিয়ে চলেছি। পিপলকোঠী পৌঁছে চামোলীর শেষ বাসটা ধরতে হবে। ঠিক এক ঘণ্টায় জোশীমঠ থেকে সাড়ে তিনমাইল দূরে 'ভড়কুলায়' এলাম। একটা চায়ের দোকানে বসে এক পোয়া গরম দুধ খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার চলা শুরু করি। এখানে দুধের সের এক টাকা; জোশীমঠে দেড়টাকা আর বদরিকাশ্রমে দুই থেকে আড়াই টাকা।

ভরকুলা থেকে একমাইল পথ চলে বেলা সওয়া দশটায় এপথের বিখ্যাত পাকদণ্ডী একদমে পার হয়ে আসি আঠাশ মিনিটে। যাবার সময় কি নিদারুণ কষ্ট পেয়েছি এই পাকদণ্ডীতে উঠতে। প্রায় তিনমাইল পথ চলার সাশ্রয় হয় এই বিরাট পাকদণ্ডীতে, কিন্তু কি লাভ হয়েছে? মনে হয় মোটরের সোজা পথে যাওয়াই ভালো ছিল। তবে পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে কোন কষ্ট হয় না। এমন কি পানচাক্কির ধারে বড় ঝরণাটাও নিজেই পার হয়ে এসেছি।

আরও একমাইল এগিয়ে 'হেলাঙ্গ' পৌঁছলাম বেলা এগারটায়। দোকানে ভাত, ডাল ও আলুর তরকারী খেলাম আধ প্লেট আট আনায়। যাবার সময়ে এই দোকানে এক গেলাস চা পর্যন্ত জোটেনি। বেলা এগারটার অল্প পরেই এপথের দোকানগুলো যাত্রী অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অনিশ্চিত উপার্জনের আশায় এরা কাঠের আগুন জ্বালিয়ে রাখে না।

বেলা সাড়ে এগারটায় একটা সেউ চিবুতে চিবুতে আবার চলা শুরু করি।

ছবি তুলতে না পারার দুঃখ কাঁটার মতো মনে বিঁধে আছে। চারিদিকের সৌন্দর্য আজ আর বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখি না। প্রখর রোদের তেজে মাথা ও মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এপথে ছায়া বড় একটা মেলে না। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পায়ের শিরায় টান ধরেছে, ঘাড়ের কাছে শিরদাঁড়াও আপত্তি জানাচ্ছে। তবে উঁচু নিচু বিশেষ নেই এই যা রক্ষে। ভাঙ্গা পথ মেরামত চলেছে। এখন জীপ গাড়ী কোনওক্রমে চলছে, বাসের জন্য প্রস্তুত হতে আরও ৮।১০ দিন সময় লাগবে। রাস্তা মেরামত সম্পূর্ণ হলে আবার মোটরবাস চলবে জোশীমঠ পর্যন্ত। কিন্তু মেরামতের ধরন দেখে আশঙ্কা হয় বেশীদিন স্থায়ী হবে না। এই ভঙ্গুর মাটি ও পাথরের পাহাড়গুলোতে বৃষ্টির জল পড়লেই ধস নেমে রাস্তা ভেঙ্গে দেয়। এবিষয়ে দার্জিলিঙের রাস্তাঘাট অনেকটা যত্নে রাখা হয়েছে। সিমেন্ট বাঁধানো কৃত্রিম ঝরণা সৃষ্টি করায় দার্জিলিঙের পাহাড়ে ধস নামা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। গাড়োয়ালের এই পথগুলিতে সে রকম কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা কেন করা হয়নি জানি না। অবশ্য আশা করি এ বিষয়ে বিশেজ্ঞরা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন।

ঘর্মাক্ত কলেবরে বেলা সওয়া একটায় 'বেলাকুচীতে' উপস্থিত হলাম। একটা দোকানে বসে চা খেয়েই আবার হাঁটা শুরু করি। বেলা সাড়ে তিনটায় পিপলকোঠী থেকে শেষ বাসটা ছেড়ে যাবে নিচের পথে। দুই ঘন্টায় আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। শরীর রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, কিন্তু মনকে দৃঢ় করে এগিয়ে চলি ; আজ আমার চামোলিতে পৌঁছানোর কথা। সেখানে ডাকবাংলোতে আশ্রয় সংগ্রহ করা আছে।

পারব কি পারব না, এই চিন্তায় যখন আমার মন দুলছে, তখন একটা আশাতীত প্রাপ্তিযোগ ঘটল। কোথা থেকে একটা জীপ গাড়ী এসে আমার সামনে উপস্থিত হল। আর একবার অনুরোধ করতেই ড্রাইভার আমাকে গাড়ীতে তুলে নিল। গাড়ীর পেছনে চাল ও গমের বস্তার ওপরে কোন রকমে বসে দু হাত দিয়ে গাড়ীর ছাদের রডটা ধরে চলেছি পথের ধুলো খেতে খেতে। অবস্থাটা মোটেই আরামদায়ক নয় তবু হাঁটার চেয়ে অনেক ভাল। আমার সঙ্গে আরও একজন পাহাড়ী পথিক উঠেছে গাড়ীর পেছনে। আমার কুলিটার দেখা নেই, কাছে থাকলে তাকেও তুলে নেওয়া যেত।

বেলা প্রায় আড়াইটেয় পিপলকোঠীতে এসে ঝাঁকুনী ও ধুলোর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। চালককে ধন্যবাদ দিয়ে বাস-ডিপোর

দিকে পা বাড়াই। সৈন্যবিভাগের লোক চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আমায় এক তরফা কৃতজ্ঞ করে রাখল।

শেষ বাসে একটা সীট দখল করে বসে আছি কুলির পথ চেয়ে। ক্রমে সাড়ে তিনটা বাজল, শেষ বাস ছেড়ে গেল, আমি পড়ে রইলাম পিপলকোঠীতে। শ্রীমান ঘুরবাহাদুর এলেন বেলা তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে, অর্থাৎ বাসটা ছেড়ে যাবার বিশ মিনিট বাদে। 'বিশ সাল বাদ' হলেও ক্ষতি ছিল না। যা হবার তা হয়েই গেছে! অতএব মালপত্র নিয়ে আবার সেই ডাকবাংলোতে হাজির হই। কিন্তু আজ রবিবার অফিস বন্ধ। চৌকিদারও অনুপস্থিত। পাশে ওভারসিয়ারের বাড়ীতে খোঁজ করে দেখি তিনিও বাড়ী নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে চৌকিদারের দেখা পেলাম। তাকে আমার চামোলীর ডাকবাংলোর অনুমতি পত্রটা দেখিয়ে বর্তমান অসুবিধার কথা খুলে বলি। চৌকিদার একটা কামরা খুলে নিজেই আমার বিছানাপত্র পেতে সব গুছিয়ে দিল। স্নানের ঘর থেকে মুখহাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলিয়ে সন্ধ্যার সময় নিচের বাজারে গেলাম রাতের আহারের সন্ধানে। এখানেও খুঁজেপেতে 'মীট' আবিষ্কার করা গেল। রান্না একই রকম। কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে উদরসাৎ করি। শরীরটার ওপরে বিশেষ ধকল চলেছে, হাজার হলেও মাংসের ঝোল পেটে গেলে কিছু কাজে দেবে। শুধু মনে হয় এরা কি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে না মহাতীর্থের পথের ধারের এই খাওয়ার ও থাকবার স্থানগুলো? প্রতি বছর বহু সহস্র যাত্রী এপথে আসেন, এবং তীর্থযাত্রা ছাড়াও অন্যান্য বহু কাজে কতশত লোক এপথ দিয়ে অবিরত যাতায়াত করেন। অলকানন্দা উপত্যকার সৌন্দর্য বিখ্যাত পর্বতারোহী-দের মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানগুলির অন্যতম। ভারতের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান-গুলিতে ভ্রমণের সুখ স্বাচ্ছন্দের বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে অথচ নিতান্ত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এই গাড়োয়াল হিমালয়। এখন সৈন্যবিভাগের প্রয়োজনে কিছু কিছু রাস্তা তৈরী হচ্ছে। শুনেছি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এখনও সাব্যস্ত হয়নি যে কোন্ বিভাগ এই অঞ্চলের উন্নতি বিধানে হস্তক্ষেপ করবেন। সম্ভবতঃ আরও কয়েক বছর চিঠি লেখালিখিতেই কাটবে। তবু হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে আপন গরিমায়। দীনতা ও দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করে —ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে নদ, নদী, গিরি ও অরণ্যের মাঝে!

॥ ১৬ ॥

আজ ৮ই অক্টোবর। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙল। বেশ শীত। ঘুমটা বেশ জমেছিল কিন্তু ঘুরবাহাদুরের ডাকাডাকিতে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। সকালের প্রথম গেটেই সে যেতে চায়। তার হিসাবপত্র চুকিয়ে দিতে হবে। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে তার টাকাকড়ি শোধ করে নিশ্চিন্ত হলাম। চৌকিদার বাজার থেকে একপট চা এনে দিল। খেয়ে বাগানে পায়চারী করি। আজ আর আমার তাড়া নেই। বেশ ভাল লাগে পিপলকোঠীর এই ডাকবাংলোটি। এর স্থান নির্বাচনেরও তারিফ করতে ইচ্ছা হয়। অল্প উঁচু পাহাড়ের মাথায় ডাকবাংলো। উন্নত পর্বতশ্রেণীর মাঝে একটি উপত্যকা, শস্যে ভরা ক্ষেত খামার বাজার, সৈন্য-বিভাগের ডিপো নিয়ে বেশ কর্মচঞ্চল স্থান, অথচ শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ

চৌকিদারকে দিয়ে এক বালতি গরম জল আনিয়ে, দাড়ি কামিয়ে স্নান করি আরামে। যাবার সময় এই ডাকবাংলোতেই শেষ দাড়ি কামিয়েছিলাম বার দিন আগে। অনেকদিন বাদে আবার বেশ ভদ্রস্থ হওয়া গেল। গোছগাছ করে নিয়ে একটা কুলি ডাকিয়ে মালপত্র সমেত বাজারে এসে একটা দোকান থেকে চা ও রসগোল্লা খেয়ে নিলাম। চৌকিদারকে বকশিশ দিয়ে সাড়ে নটায় দ্বিতীয় গেটে চামোলী অভিমুখে রওনা হলাম। মাত্র এগার মাইল পথ। বাসে একঘণ্টায় চামোলীতে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে দশটায়। পথে বিরেহীতে খোঁজ করে জানলাম, গোহণার পথের জন্য কুলি সংগ্রহ করতে হবে চামোলী থেকে।

মালপত্র নিয়ে আবার সেই উত্তুঙ্গ পাহাড়টার মাথায় চড়া। পূর্তবিভাগের ডাকবাংলোর বন্ধ ঘরের সামনে জিনিসপত্র রেখে চললাম আরও উপরে—জেলা-শাসকের বাংলোতে। ওয়াটাল সাহেব জরুরী বেতার পেয়ে লক্ষ্ণৌতে গেছেন সরকারী কাজে। তাঁর কেরানীবাবু পন্থজীর কাছ থেকে নির্মলদাদের অনুমতি-পত্রগুলো নিয়ে এবং বিরেহী ও গোহণার বন-বিভাগের ডাকবাংলোতে স্থান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে বেলা বারটায় ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ঘুমন্ত চৌকিদারকে তুলে জানতে পারলাম ডাকবাংলোর দুটো ঘরই ভর্তি। একটিতে সরকারী ডাক্তারবাবু সপরিবারে আছেন, অন্যটিতে দুজন সরকারী কর্মচারী এসেছেন গত রাত্রে। কালকের তারিখের জন্য আমার

অনুমতি পত্রটা দেখিয়ে বললাম ওঁরা নিশ্চয়ই বিনানুমতিতে এসেছেন। অতএব আমিও একটা খাটিয়ায় বিছানা পত্র রেখে, পাহাড়ের নিচে বড রাস্তার ওপরে খেতে এলাম লালার দোকানে। ভাত, ডাল, তরকারী এবং 'মীট' জুটল। জঠরাগ্নি শান্ত করে হাঁফাতে হাঁফাতে আবার সেই পাহাড়ের মাথায় ডাকবাংলোতে। এত জায়গা থাকতে এই উঁচু পাহাড়ের মাথায় কেন যে সরকারী দপ্তর ও ডাকবাংলো ইত্যাদি নির্মাণ করার সার্থকতা খুঁজে পাই না। ওখানে প্রশস্ত নদীর দুই তীরে প্রচুর জায়গা রয়েছে। তবে সম্প্রতি সেখানেও কিছু কিছু বাড়ী ঘর তৈরী হচ্ছে।

ডাকবাংলোতে ফিরে এসে পাশের ঘরের ডাক্তার পাণ্ডের সঙ্গে বহুক্ষণ গল্প হল। ভদ্রলোক স্থানীয় হাসপাতালে দুমাসের জন্য বদলী হয়ে এসেছেন। এখনও বাড়ী পান নি। স্ত্রী, চারটি ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ শ্বশুর ও ষাট মন মাল পত্র সমেত এই ডাকবাংলোর একটি মাত্র ঘরে কোন রকমে আছেন প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ। আগামীকাল একটা ছোট বাড়ী পাওয়ার কথা আছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী প্রবাসী বাঙ্গালী, ডাক্তার নিজে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের অধিবাসী। বেশ আলাপী ও শান্ত প্রকৃতির এই ডাক্তারবাবুটি। নানা বিষয়ে ওর সঙ্গে আলাপ হল। বললেন হাসপাতালে বসে প্রত্যহ তিনি দেখেন শুধু ক্ষয়রোগ ও অপুষ্টির ভয়াবহ প্রসার। অতি দরিদ্র এই গাড়োয়ালীরা। সারাবছরের উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান নেই, চাষের উপযুক্ত জমি নেই। খাবার সংস্থানের অন্য কোনও উপায়ও নেই। শীতপ্রধান এই পাহাড়ী জায়গায় শুধু খাদ্যের অভাবেই গোটা দেশটা রুগ্ন ও অসুস্থ লোকে ভরে গেছে। দুঃখ করে তিনি বলেন, 'ওষুধ দিয়ে কি করব, দুমুঠো খেতে পাওয়া যেখানে প্রধান সমস্যা ?'

শুনি আর ভাবি, কবে আমাদের দেশের এই প্রাথমিক চাহিদা মিটবে ! কবে প্রতিটি ভারতবাসী দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাবে ! বহু শতাব্দীর অভিশাপে এই দারিদ্র্য আর অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আমরা মুক্তি পাব কি ?

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আমার ঘরের অন্য অধিবাসীদের এখনও দেখা নেই। বেশ অস্বস্তি অনুভব করি। অল্পবয়সী চৌকিদারটি নূতন লোক, মাত্র কয়েকদিন হল কাজে লেগেছে। সে আমায় ভরসা দেয়। একপট চাও তৈরী করে আনে। আগের বারে এই ডাকবাংলোতে এসে রাত কাটিয়ে গেছি, অথচ চৌকিদারের দেখা মেলেনি। শুনলাম সে চৌকিদার অফিসে বদলী হয়েছে তার পদোন্নতি

হয়েছে। সন্ধ্যার পরে আবার সেই লালার দোকানে ডাল, রুটি ও আলুর তরকারী খেয়ে অনেক কষ্টে উঠে এলাম সংশয় যুক্ত রাতের ডেরার দিকে। ডাকবাংলোর ঘরটা হ্যাজাকের আলোয় কয়েক জনের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। ধীরে ঘরে ঢুকে বললাম, 'অপরাধী হাজির হয়েছে'। সসব্যস্তে আমায় অভ্যর্থনা জানালেন দুজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মুহূর্তে আপোস হয়ে গেল। আমরা তিনজনেই রাতটুকু কাটাবো এই ঘরটাতে। সকলেই খুশী। একজন আলমোড়া-বাসী ক্ষত্রিয় আর একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ। কনৌজী ভদ্রলোককে বললাম যে আমিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁব সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আমার। অতিমাত্রায় খুশী হলেন ভদ্রলোক। ক্ষত্রিয় ঘরের টেবিলে বসে আর ব্রাহ্মণ রান্নাঘরে গিয়ে মাটিতে বসে রাতের আহার সমাধা করলেন। খাওয়া শেষে ধূমপান করি আমি ও ক্ষত্রিয়। কনৌজী অনেক রাত অবধি ধূমপানের অপকারিতা তথা অনর্থক অর্থ অপচয়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ১৭ ॥

বিদ্রোহী

পরদিন অতি প্রত্যূষে আমার প্রতিবেশীরা বিদায় নিলেন। যাচ্ছেন রুদ্র-প্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ। ওঁরা চামোলীতে এসেছিলেন সরকারী কৃষিসংস্থার বার্ষিক প্রতিযোগিতার কাজে। এখন সরকারী কাজ সেরে, তীর্থধর্ম করে ঘরে ফিরবেন। তাঁদের সঙ্গে জীপ-গাড়ী আছে, বাসের প্রথম গেট চালু হবার আগেই ওঁরা রওনা হয়ে যান। কম্বলের তলা থেকে মুখ বার করে বিদায় সম্ভাষণ জানাই।

আজ সকালে পাশের ঘরের ডাক্তারবাবু প্রাতরাশের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গতকাল রাতে ওঁদের কাছে খাইনি বলে দুঃখিত হয়েছেন। কাল প্রতিবেশীরাও চেয়েছিলেন আমায় খাওয়াতে।

পাশের ঘরে এসে আলাপ হল ডাঃ পাণ্ডের স্ত্রী ও তাঁর বাবা বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশাইয়ের সঙ্গে। ভদ্রলোক চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ, কোন্নগরে বাড়ী ছিল। মাত্র তিন বৎসর বয়সে তিনি কোন্নগর ছেড়ে তাঁর পিতার কর্মস্থান উত্তরপ্রদেশে চলে আসেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে একবার শুধু

দেশে গিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে রেলবিভাগে সামান্য কিছুদিন চাকুরীও করেছিলেন। তার পরে দাসত্বে অরুচি ধরায় বাকী জীবনটা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করে গোরক্ষপুরে কাটিয়েছেন। চারটি উপযুক্ত ছেলেমেয়ে রেখে স্ত্রী গত হয়েছেন। সর্বকনিষ্ঠা এই ডাক্তারের স্ত্রীর কাছেই শেষজীবনের অবসর ভোগ করছেন। মৃতদার বৃদ্ধের শেষ অবলম্বন। দীর্ঘদিন পরে প্রবাসী পিতা ও কন্যা একজন বাঙ্গালীকে কাছে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। ডাক্তারগৃহিণী জামাকাপড় রাখবার ছোট্ট ঘরটাতে স্টোভে চিড়া, আলু ও পাঁপর ভেজে দিলেন বৃদ্ধ মুখুজ্যেমশায় দুঃখ করে বলেন কিছুই পাওয়া যায় না গাড়োয়ালের জেলা সদর এই চামোলীতে।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন, হাসপাতালে বসতে হবে। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলাম মুখুজ্যেমশায়ের সঙ্গে। আজ সকালে কলকাতা থেকে দিল্লী হয়ে নির্মলদা সপরিবারে এখানে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। প্রায় তিন সপ্তাহ হতে চলল বাইরের জগতের সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। কলকাতার কোন চিঠিপত্র পাইনি। সকালবেলায় চৌকিদারকে পাঠিয়েছি নিচের প্রথম গেট অর্থাৎ কর্ণপ্রয়াগ থেকে আগত প্রথম বাস দেখতে। চৌকিদার এসে জানাল প্রথম বাসে নির্মলদা আসেন নি। এর পরে বেলা সাড়ে এগারোটায় দ্বিতীয় গেট দেখতে নিজেই যাবো। নিষেধ করা সত্ত্বেও ডাঃ পাণ্ডের স্ত্রী আমার দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করছেন। বেলা দশটায় স্নান সেরে উপরে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে এলাম। পন্থজীর কাছ থেকে বন-বিভাগের ডাকবাংলোর জন্য অনুমতি পত্র যোগাড় করে ফিরে আসি ডাকবাংলোতে। পন্থজী আলাপ করিয়ে দিলেন স্থানীয় কালেক্টরেটের নাজীর বর্তওয়ালজীর সঙ্গে। নাজীরই আমার বিরেহী ও গোহণায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বেলা এগারোটা বেজেছে, নিচের বাস-ডিপোতে যাবার জন্যে আমার ব্যস্ততা দেখে মুখুজ্যেমশাই আমায় খেতে ডাকছেন। ঠিক এমনি সময়ে নির্মলদার সঙ্গী ও আত্মীয় আমাদের বিনয়দা এসে উপস্থিত হলেন। বিনয়দা বললেন, তাঁরা সকলে বেলা দশটায় নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে চামোলীতে পৌঁছে আমায় দেখতে না পেয়ে, বাস রাস্তা থেকে অনেকটা নিচে অলকানন্দার ধারে বাজারের মধ্যে কালি কমলী ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন। বিনয়দাকে নিয়ে নির্মলদা এখন এসেছেন অনুমতি পত্রের খোঁজে সদর-দপ্তরে। তাড়াতাড়ি দপ্তর থেকে নির্মলদাকে ডেকে নিয়ে এলাম ডাকবাংলোতে। আমায় দেখেই নির্মলদা চেঁচিয়ে

উঠলেন, 'ভায়া নন্দনকানন, হেমকুণ্ড, বদরিকাশ্রম তুমি একা ঘুরে এলে, এবারে আমরাও যাব কিছু দেখতে। আমাদের কথা কি তোমার মনে আছে?'

মহা অপ্রস্তুত হই চৌকিদারের ওপরে নির্ভর করার জন্য। তারপরে যখন শুনলাম সকন্যা বৌদি আছেন ধর্মশালায়, ছুটলাম সেদিকে। যাবার সময় মুখুজ্যেমশায়কে বলে গেলাম আমার জন্য তৈরী ভাত নির্মলদাকে খাইয়ে, আমার মালপত্র সমেত নিচে পাঠিয়ে দিতে।

বাজারের মধ্যে কালি কমলী ধর্মশালার সংলগ্ন হোটেলে নিজে খেয়ে বৌদিদের খাবার ব্যবস্থা করে রেখে বাস-ডিপোতে এসে পিপলকোঠীব বাসে আমাদের কয়জনের স্থান সংগ্রহ করে গোহণার পথের কুলির ব্যবস্থা করলাম দোকানদার লালাজীর মারফত। স্থির হল আগামীকাল প্রত্যূষে পাঁচজন কুলি এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে বিরেহীতে আমাদের কাছে উপস্থিত হবে। আমরা আজ সেখানেই রাত কাটাবো। ব্যবস্থা ঠিক করে বেলা দুটোর বাসে চামোলী থেকে পাঁচমাইল দূরে বিরেহীগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম বিরেহীতে এসে নামলাম আধঘণ্টায়। এখানে বিরেহীগঙ্গার ওপরে সেতু পার হয়ে মোটরবাস অল্প দূরে গিয়ে আবার অলকানন্দার ধার দিয়ে পিপলকোঠীর দিকে চলে যায়।

লোহার পুলটার অল্পদূরে, একটা খোলা ময়দানের প্রান্তে বিরেহীগঙ্গার ধারে বন-বিভাগের ডাকবাংলো তালা বন্ধ। সেতুর পাশের দোকানদারের ছেলেকে বকশিশ দিয়ে দু মাইল দূরের গ্রাম থেকে চৌকিদারকে ডাকতে পাঠাই। তারপরে সবাই মিলে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে গল্প গুজব করি। প্রায় সন্ধ্যার সময় চৌকিদার এসে ঘর খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে রাতের খাবার ও শোবার ব্যবস্থা শুরু করা হয়। বন-বিভাগের ডাকবাংলোগুলোতে বাসনপত্র, আলো ইত্যাদি সব জিনিসই থাকে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র দুটো বালতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। জলের ব্যবস্থাও নেই, লণ্ঠনও মিলল না। বিনয়দা ছোট কাঁচের শিশির মুখে আলুর ছিপি বসিয়ে সুন্দর কেরোসিন তেলের প্রদীপ বানিয়ে দিলেন। স্টোভে রান্না চড়ল।

ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিরেহীগঙ্গা। ডাকবাংলোর পেছনে শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল ঝাউ ও চীড় গাছের। সামনে প্রকাণ্ড খোলা ময়দানের প্রান্তে চামোলী-পিপলকোঠীর পথ।

বৌদির সযত্নে তৈরী খিঁচুড়ী খেয়ে নিয়ে গল্পের আসর বসে। আমার একক পদযাত্রার অবসান হয়েছে। আজ আমরা ছজন। এক সঙ্গে চলেছি গোহণা

হ্রদ দর্শনে। এখান থেকে নয় মাইল হ্রদের এপারে ধর্মশালা আর ওপারে এক মাইল দূরে ডাকবাংলো আছে।

॥ ১৮ ॥

গোণাতালের পথে

১০ই অক্টোবর। বিরেহী ডাকবাংলোতে ঘুম ভাঙল ভোর ছটায়। রাতে বেশ শীত বোধ হয়েছে। গতকাল সারাদিন প্রচুর রোদ থাকায় খুব গরম ছিল। কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই নেমে এসেছিল হিমালয়ান-হিম। বিছানায় বসেই এক কাপ চা পেলাম। অনেকদিন পরে—বড় ভাল লাগল। নবাবী চালে চা খেয়ে ধীরে সুস্থে শয্যা ত্যাগ করলাম। ডাকবাংলোর পাশে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে নদীর তীরে আসি। সকালের রোদে ভাল করে স্নান সেরে ফিরে আসার সময় বাংলোর ধারে একটা বড় সাপের খোলস নজরে পড়ল—গোখুরা জাতীয় সাপ।

বেলা বাড়ছে কিন্তু কুলিদের দেখা নেই। স্থানীয় দু একজন লোককে বলেও এখান থেকে মোটবাহক সংগ্রহ করা গেল না। অগত্যা বেলা দশটার বাসে আবার চামোলী রওনা হলাম। নাজীর বর্তওয়ালজীর সঙ্গে বাসেই দেখা হল। তাঁকে ধরে ব্যবস্থাও হয়ে গেল চামোলীতে। কুলির সর্দার আমার কাছ থেকে অগ্রিম দু টাকা নিয়ে আশ্বাস দিলে, তার কুলিরা আহারাদি সেরেই রওনা হচ্ছে। ফিরতি গেটে বিরেহীতে ফিরে এলাম বেলা সওয়া এগারটায়। চামোলী থেকে একটা লণ্ঠনও কিনে নিয়ে এসেছি।

ভাত, ডাল ও আলুর তরকারী রেঁধেছেন বৌদি। দুপুরের আহার সমাধা করে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করি কুলিদের। আজ সকালে জোশীমঠ থেকে এক দল সৈন্য এসে ডাকবাংলোর সামনের ময়দানে টিনের ছাউনীটা দখল করেছে। শুনলাম ওরা রসদ চলাচলের বাহিনী। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রাঁধা, খাওয়া ও খচ্চরের পরিচর্যা করে বেলা দুটো নাগাদ ওরাও চলে গেল গন্তব্যস্থান অভিমুখে। কিন্তু আমাদের কুলিদের দেখা নেই। স্থানীয় দোকানদার ভয় দেখায়, আজ আর গোণাতালের দিকে এগুনো ঠিক হবে না। দীর্ঘ নয় মাইল পাহাড়ীপথ, সকালে না রওনা হলে গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বিরেহী নদীর অপর পারের পাহাড়গুলোর মাথায় অল্প মেঘ উঁকি দেয়। ভাবি এর উপরে যদি

বৃষ্টি নামে। নিজের জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু সঙ্গীদের কথা ভেবে মনটা একটু চঞ্চল হয়। ভেতরের অন্ধসংস্কার ভয় দেখায়, দুটো নদীর গতিপথ পরিক্রমা শেষে ক্যামেরা অকেজো হয়ে গেল, তার ওপরে আবার বাধা। হয়তো মঙ্গলময়ের ইচ্ছা নয়, আমি এযাত্রায় আর ভ্রমণ করি। পরক্ষণেই মনে হয় এ আমার নিছক দুর্বলতা, তাছাড়া নির্মলদারা কতদূর থেকে এসেছেন, শুধু একটিমাত্র স্থানও তাঁরা দেখতে পাবেন না ?

বেলা আড়াইটের পরে এদিকের শেষ বাসে চড়ে সেই ধনবাহাদুর পাঁচজন কুলি নিয়ে এল। আমি বারবার করে বলে দিয়েছিলাম বাসের জন্য অপেক্ষা না করতে। কিন্তু পাঁচ মাইল পথ শুধু শুধু হাঁটা ওদের পছন্দ হয়নি। অন্যায় যতই করে থাক ধনবাহাদুর কিন্তু কুলি সংগ্রহ করে দেবার মজুরী কুলি প্রতি একটাকা হিসাবে মোট পাঁচ টাকা আদায় করে নিল সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে। তারপরে সে আমাদের পাঠিয়ে দিল অনিশ্চয়ের পথে। বেলা সওয়া তিনটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম পথে।

ডাকবাংলোর পেছনে জঙ্গলের ধার দিয়ে বিরেহীগঙ্গার গতিপথ অবলম্বন করে, পাহাড়ের গায়ে সরু পায়েচলা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। সরকারী নাম গোহণা। স্থানীয়রা বলে গোণাতাল বা বিরেহীতাল। উত্তরপ্রদেশবাসীরা হ্রদকে বলে 'তাল'। পাহাড়ের বরফ হিমবাহ বয়ে নেমে আসে। সেই বরফ সূর্যের তেজে গলতে শুরু করেও ঝরণা হয়ে নেমে আসে পার্বত্য উপত্যকায়। বহু ঝরণার মিলিত ধারা নদীতে পরিণত হয়ে, পাহাড় জঙ্গল কেটে ভীম বেগে ছুটে চলে সমতলের দিকে। হিমালয়ের সর্বত্র প্রথমে নদী তার পথ করে নিয়েছে, তারপরে মানুষ সেই নদীপথ অবলম্বন করে, তারই ধার দিয়ে হিমালয়ের গভীরে যাবার পথ খুঁজে পেয়েছে। নদী হিমালয় পথযাত্রীর নিশানা।

পুরাণের মতে বিরেহীগঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে সতীহারা মহাদেবের অশ্রুজলে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর বিরহকাতর শিব হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন, তাঁর চোখের জলে উৎপত্তি হয় এই বিরেহীগঙ্গার। দেবাদিদেবের সেই সুকঠোর তপস্যার প্রভাবেই দেবী চণ্ডী আবার অবতীর্ণা হলেন—পার্বতী রূপে।

পণ্ডিতদের মতে হিন্দু-আর্যসভ্যতার গোড়াপত্তন হয় কুরুক্ষেত্রের নিকটে ব্রহ্মাবর্তে—সরস্বতী নদীর তীরে, যেখানে গায়ত্রী ব্যক্ত হয়েছেন বিশ্বামিত্র ঋষির কণ্ঠে। আর পূর্ণবিকশিত হিন্দুধর্মের মূলস্তম্ভ এই মধ্যহিমালয়, যার প্রতিটি নদ

নদী, গিরি ও অরণ্য আজও হিন্দু দেব দেবী, মুনি ঋষিদের নামে প্রকাশিত। মহাভারতের যুগে দর্শন, যোগ ও ধর্মের চরম পরিণতি, আবার মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনী সম্ভূত এই গাড়োয়াল হিমালয় জগদ্‌গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের উত্তরাখণ্ড। কালের করাল হস্তও যেন এখানে সঙ্কুচিত!

গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে বিরেহীগঙ্গার প্রবাহ নেমে এসেছে। দুপাশের উঁচু পাহাড়গুলো ঝাউ, দেবদারু ও চীড় প্রভৃতি বড় বড় গাছে ভর্তি। ঘাসবন ও নাম-না-জানা জংলা গাছের ভেতর দিয়ে কখনও নদীর তীর ধরে, কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচু নিচু সরু পায়েচলা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা ছজন। পেছনে আসছে মালপত্র নিয়ে নেপালী দোতিয়াল পাঁচজন। বিরেহী নদী আমাদের বাঁদিক দিয়ে বয়ে চলেছে। আমাদের ডান পাশে উঁচু দেওয়ালের মত পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলাকীর্ণ এই সব পাহাড়ে বাঘ, ভালুক, হরিণ, সজারু প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে। নির্মলদার মেয়ে ডলুর পায়ের কাছ দিয়ে একটা সাপ বিদ্যুৎ গতিতে রাস্তা পার হয়ে গেল। কিন্তু থামলে চলবে না। দীর্ঘ নয় মাইল পথ—আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মাঝে মাঝে ধস নেমে পথ ভেঙ্গে গেছে। সন্তর্পণে সেগুলো পার হয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে জুতো মোজা খুলে নদীর ন্যায় বড় বড় ঝরণা পার হতে হয়। আলগা পিছল পাথরে পা হড়কে জলের মধ্যে পড়ে যাই।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি নামল। বিপত্তির ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ করে দিল। ক্রমে অনন্ধকার হয়ে আসে, পথ যায় হারিয়ে। লণ্ঠন হাতে বিনয়দা আগে চলেছেন তাঁর পিছনে সারবন্দী আমরা। শুধুমাত্র পদক্ষেপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। মাঝে একটা বিরাট ধস পার হতে হয়, কাঁকড়ার মত চার হাত পা দিয়ে। ধসের ভেতর থেকে জেগে ওঠা গাছের শিকড় আঁকড়ে ধরে কোনমতে এপারে আসি। এখানেও প্রবীণ বিনয়দা আমাদের পথ দেখান, সাহস যোগান। কুলিরা পথের মাঝখানে রাত্রের মত যাত্রা স্থগিত রাখতে চায়। অথচ এদের দেরীতেই আজ এই বিপত্তি। অবশ্য আমাদের অবিমৃষ্যকারিতাও আছে। ক্রমে সামান্য পথটুকুও হয়ে শেষ যায় একটা পাহাড়ী নদীর কিনারে। বেশ চওড়া নদী। প্রবল বেগে বর্ষার জল বয়ে চলেছে। পার হওয়া অসম্ভব। রাত আটটা বাজে। বেলা বারোটায় খাওয়া মুসুর ডালের সঙ্গে আতপ চালের ভাত কোথায় চলে গেছে। সবাই অবসন্ন হয়ে বসে পড়ি নদীর কিনারে ঘন জঙ্গলের ধারে।

একটু বাদে কুলিরা এসে পড়ে সমস্যার সমাধান করে দেয়। লণ্ঠন হাতে নদীর মধ্যে নেমে তারা প্রথমে পথ খুঁজে নেয়, তারপরে সকলকে হাত ধরে সন্তর্পণে পার করে দেয়। নদী-গর্ভে বড ছোট পাথরের নুড়ি। সাবধানে পা ফেলে সবাই অপর পারে উঠে আসি।

নদীর এপারে একটা কুটির পেলাম। সেখানেই আশ্রয় নিলাম আমরা। রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। খড়ের চাল দেওয়া বেশ বড় দুখানি মাটির ঘর। দরজা কপাটহীন। কুলিরা বলে, এটা একটা স্কুলবাড়ী। প্রশস্ত উঠানের মধ্যে তাঁবু ফেলে সরকারী জরীপ বিভাগের কর্মীরাও রয়েছেন। আমরা একটা ঘরেই সবাই মিলে আশ্রয় নিলাম। বেশ রোমাঞ্চকর অভিযানের মত লাগছে।

শ্রান্ত অবসন্ন দেহে রাঁধা খাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাছের গ্রাম এখান থেকে দুমাইল দূরে, এই রাতে অগম্য। স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরী হল, তার সঙ্গে শুকনো চিঁড়ে। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে বিছানায় শুয়ে মাতৃনাম স্মরণ করি। আজ জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যার পর থেকেই শুধু মায়ের চিন্তায় মনকে ডুবিয়ে রেখেছি। দুরন্ত শিশু সারাদিন অশান্ত উপদ্রবের পরে সন্ধ্যা হলেই মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে যেমন করে ঘুমায়। হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর জঙ্গলের মধ্যে রয়েছি। জানালা দরজার কপাট নেই, দরজায় একটা কাপড়ের পরদা ঝুলিয়ে আব্রু করা হয়েছে। এখন মায়ের কোলই একমাত্র ভরসা। সুপণ্ডিত বিনয়দা ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করেন, আমি মনে মনে শুধু মাতৃনাম স্মরণ করে চলেছি।

॥ ১৩ ॥

গোণা তাল

ভূমি-শয্যায় কখন যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম মনে নেই। সম্পূর্ণ নিরুপদ্রবে কেটে গেছে রাত। ঘুম ভাঙল বৌদির ডাকে, সকালের চা প্রস্তুত।

সকালের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় বাইরে বেরিয়ে মুখহাত ধুয়ে আর একবার চা বিস্কুট খেয়ে বেলা নটায় পথে বের হই।

গত কাল রাতে বিরেহী থেকে সাত মাইল দূরে গোণা স্কুলে আমরা রাত কাটিয়েছি। এখানে বিরেহীর দুই তীরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, রামদানার

ক্ষেত। আর প্রায় সমতল পাহাড়ের গায়ে ঘাসের জঙ্গল ও পশুচারণ ক্ষেত্র। ওপারের পাহাড়ে ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত্রের উপরে গোহণা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। স্কুল বাড়ী থেকে অল্প দূরে গিয়ে বিরেহী নদী পার হতে হল। দুটো বড় গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে নদীর ওপরে, তার মাঝে ছোট ছোট কাঠ বেঁধে কাঁকর বিছানো।

নদী পার হয়ে শুরু হল চড়াই। সামনে দাঁড়িয়ে বিরাটকায় মৈথানা পাহাড়—আধখানা ধস নেমে ভেঙ্গে গেছে, বাকী আধখানা দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ছুরি দিয়ে দুখণ্ড করা নাসপাতির অধাংশ। আজ থেকে উনসত্তর বছব আগে এক বিরাট ধস নেমে এই পাহাড়টার অর্ধাংশ ভেঙ্গে যায়। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক গভীর রাত। প্রলয় গর্জনে চারিদিক সচকিত হয়। মাটি ও পাথরের বিরাট স্তূপ দিগ্‌বিদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। মৈথানা পাহাড়ে ধস নামে, বিরেহী নদীর ধারা রুদ্ধ হয়। সৃষ্ট হয় একটি সুবিশাল জলাশয়—গোহণা হ্রদ।

প্রকৃতির সেই তাণ্ডব ধ্বংসলীলার কিন্তু সেখানেই শেষ হয় না। হিমবাহ ধরে নেমে আসা বিরেহী নদীর জল ক্রমে বাড়তে থাকে হ্রদের মধ্যে। তদানিন্তন ইংরাজ সরকার শত চেষ্টাতেও কোনও উপায় খুঁজে বের করতে না পেরে সারা গাড়োয়ালে সতর্কতার আদেশ জারী করেন। প্রায় এগারো মাস ধরে প্রতিদিন এই বরফ গলা জল স্ফীত হতে হতে একদিন নিজেই ভগ্নস্তূপের বাধা ঠেলে দুর্বার গতিতে নিজের পথ করে নিল। সেই বিপুল বারিরাশি, সংহারিণী মূর্তিতে দুকূল প্লাবিত করে অলকানন্দায় মিলিত হল। অলকানন্দায় বান ডাকল। সুদূর হরিদ্বার পর্যন্ত ধ্বংসলীলা চলে নদীর আশেপাশের স্থানগুলিতে। রাজধানী শ্রীনগরের শ্রী লুপ্ত হয়ে যায় এই বন্যার ফলে। শোনা যায় একটি গ্রাম্য পরিবার গোণাবাসীদের শত নিষেধ সত্ত্বেও বাধের কাছ থেকে দূরে সরে যায় নি। বাঁধ ভাঙ্গা বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই হতভাগ্য পরিবারটি; তবে তারা মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি বেঁচে আছে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের লেখায়—'গোহণা ফকির'।

হিমালয়ের নিভৃতে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যে জন্ম হয় অপরূপ সুন্দর একটি প্রাকৃতিক হ্রদ—এই গোণাতাল। প্রায় ছ হাজার ফুট উঁচু মনোরম আবহাওয়ায় এক রমনীয় স্থান গড়ে উঠল। সৌন্দর্যপিপাসু ইংরেজ কর্মচারীরা অবকাশ যাপনের সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। হ্রদের তীরে ডাকবাংলো তৈরী হল,

হল বোট হাউস। ট্রাউট মাছের চাষ করে, রসনার তৃপ্তির ব্যবস্থাও পাকা করে নিলেন তাঁরা। এযুগে নৌকাবিলাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান গোণাতাল।

আধখানা নাসপাতির মত মৈথানা পাহাড়ের ধসে যাওয়া স্থান এত বছর পরেও তেমনি দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। কোন গাছপালা অথবা সবুজের স্পর্শ লাগে নি সেই বিরাট ক্ষতে। নদীর চারপাশেও ধস নামার চিহ্ন বর্তমান রয়েছে। নানা আকারের পাথরের চাঁই, বালি ও মাটির স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

ক্রমশ উপরে উঠছি। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। প্রায় নিশ্চিহ্ন পায়ে-চলা সরু পথরেখা ধরে এগিয়ে চলেছি। সর্বত্র বর্ষার অত্যাচার সুস্পষ্ট। দেখি এক ঝাঁক শকুন পাহাড়ের গায়ে বসে রোদ পোহাচ্ছে। হিমালয়ের এ অঞ্চলের শকুন আকৃতিতে কিছু বড় এবং রংয়েরও প্রাচুর্য আছে।

বেলা বাড়ছে, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ছে। গতকাল দুপুর থেকে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার প্রায় বন্ধ। দুরূহ পদযাত্রা! সঙ্গীদের কথা ভেবে মনটা আরও ব্যাকুল হয়। সঙ্গে রয়েছে সদ্য রোগমুক্তা ছোট মেয়ে। কিন্তু অচিরেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। গরু মোষ চরাতে চলেছে এক পাহাড়ী, তার সঙ্গে শসাব টুকরো মেশানো এক ভাঁড় ঘোল। আট আনা দিয়ে সবটাই কিনে ফেললাম। খেয়ে অনেকটা আরাম বোধ করা গেল। টাট্‌কা এই 'মাঠা' সত্যিই বলকারক।

গোণাতালের তীরে ধর্মশালায় এসে দাঁড়ালাম বেলা সাড়ে এগারোটায়। মাটি, পাথর আর কাঠের তৈরী দ্বিতল এই ধর্মশালাটি অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। ধর্মশালার পাশেই নদী, হ্রদ থেকে বেরিয়ে নিচের দিকে চলেছে। নদীর ওপরে একটা কাঠের সেতু। সেতু পার হয়ে পথ চলে গেছে হ্রদের ডান-দিক ধরে ওপারের দিকে। সেতুটা কয়েকদিন হল ভেঙ্গে পড়েছে, সম্ভবতঃ এখনও কর্তৃপক্ষের কানে সংবাদ পৌঁছয় নি। হ্রদের অপর পারে ডাকবাংলো আছে, এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। একমাত্র নৌকা ছাড়া এখন সেখানে যাবার কোন উপায় নেই। ধর্মশালার সামনের উঠানে বসে হ্রদের শোভা দেখি। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা বিশাল একটি হ্রদ। লম্বায় একমাইলের কিছু বেশী এবং চওড়া বোধহয় পাঁচ ছ'শ গজের মত। গঠন সৌন্দর্যে নাইনিতালের হ্রদ এর কাছে নিষ্প্রভ। গাঢ় সবুজ রংয়ের জল, হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

পথচারী এক গ্রামবাসী এসে জানায় সে ট্রাউট মাছ ধরে দিতে পারে। সম্মতি জানিয়ে তাকে অনুরোধ করি ডাকবাংলোর চৌকিদারকে আমাদের আগমন সংবাদটা জানাতে। ভাঙ্গা সেতুটার ওপর দিয়ে বিশেষ কৌশলে সে চলে যায় ডাকবাংলোর দিকে।

কুলিদের অপেক্ষায় বসে আছি ধর্মশালার মাঠে। এককালে ফুল ও সব্জীর বাগান ছিল এটি। এখন শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। শুনেছি এখানে বাস করতেন এক সাধু, তাঁরই চেষ্টায় আর গ্রামবাসীদের পরিশ্রমে তৈরী হয়েছিল এই ধর্মশালাটা। বাড়ীটার অবস্থাও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। একতলার ঘর দুটোতে ঢুকতে ভয় হয়।

ক্রমে চারিদিক মেঘে ঢেকে বৃষ্টি নামে, দোতলার কাঠের বারান্দায় এসে আশ্রয় নিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন, অথচ কুলিদের দেখা নেই। তাদের কাছে আমাদের যথাসর্বস্ব।

বেলা দেড়টাব পরে কুলিরা এলো। শুনি নিজেদের খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করে তবেই ওরা এসেছে। ইতিমধ্যে নৌকা চালিয়ে চৌকিদারও এসে পড়ে। নৌকাকে এরা বলে 'কিস্তি'। টিপটিপ্ করে বৃষ্টি পডছে, জোরে নামবার সম্ভাবনাও আছে। সবাই অভুক্ত, পথশ্রমে বিশেষ ক্লান্ত। স্থির হল এই ধর্ম-শালাতেই এবেলা আহারেব ব্যবস্থা হবে।

এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি কিস্তি চড়ে চৌকিদারের সঙ্গে চললাম ডাক-বাংলোতে, বাসনপত্র সব্জী সংগ্রহ করতে।

ছত্রী বিহীন এই নৌকায় চডে দাঁডটা হাতে তুলে নেই। চৌকিদার লালসিং দুহাতে দুটো দাঁড ধরে জল ঠেলতে থাকে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে আমার হাতে দাঁড় বেশীক্ষণ চলে না। হ্রদের মধ্যে প্রবল হাওয়া বইছে। শান্ত সবুজ জলে কোন স্রোত নেই। লম্বাটে ধরনের এই হ্রদের এক পারে ধর্মশালা, আর অপর পারে ডাকবাংলো। ডান দিকের তীরে হাউস-বোট থেকে ডাকবাংলো অল্প দূরে। দুজনে মিলে হাওয়ার বিরুদ্ধে নৌকা ঠেলে প্রায় আধ ঘণ্টায় বোট-হাউসে পৌঁছলাম। নৌকা বেঁধে রেখে ডাকবাংলোতে চলি। চমৎকার ফুল ও সব্জীর বাগানে ঘেরা ডাকবাংলো। গোটা গাড়োয়ালে এত সুসজ্জিত সুন্দর, বাগানে ঘেরা বাড়ী আর নজরে পড়েনি। কিছু বাসনপত্র ও বাগান থেকে টাট্কা টমাটো, শসা ও কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হয় বোট-হাউসে। বৃষ্টির জোর ক্রমেই বাড়ছে। বোট-হাউসে কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করি বৃষ্টি বন্ধ হবার আশায়। মাছ ধরার লোকটিও এসে মিলিত হল এখানে। আমাদের জন্য কয়েকটা ট্রাউট মাছ ও তার নিজের জন্য প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ী ছাগলের মাথা শিকার করে ফিরছে সে।

বোট-হাউসটার ভেতরে কাঠের পাটাতন দেওয়া। দুটো ছোট ছোট ঘর পাশাপাশি। বর্ষার সময় হ্রদের জল ।জল বাড়লে, নৌকাটা এই ঘরে রাখা থাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে। কয়েক বছর আগে হ্রদের জল অতিরিক্ত বেড়ে এই বোট-হাউসটার সামান্য ক্ষতি হয়েছিল। এখান থেকে সামান্য দূরে, উপরের পাহাড়ে চৌকিদরের বাড়ী। ডাকবাংলোর উপরের পাহাড়ে গত দু বছর হল আপেল ও নাসপাতির চাষ শুরু করা হয়েছে। ডাকবাংলো থেকে 'কুয়ারী গিরিবর্ত্মে'র' (Kuari Pass) পথ দেখা যায়। সে পথ অতিরিক্ত, বর্ষার ফলে এখন অগম্য। 'পাহাড়ী বকরীও যেতে পারবে না', বললে চৌকিদার। চৌকিদারের কাছে শুনলাম ডাকবাংলো থেকে উপরের দিকে বিখ্যাত ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি পর্বতের দিকে অনেক সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে। কয়েকটি ছোট বড় তাল, পুঁইগড়ি নদীর সঙ্গম ও হিমবাহ প্রভৃতি স্থানগুলো বেড়ানোর পক্ষে অপূর্ব সুন্দর। ভারি সুন্দর, সহজ ব্যবহার এই চৌকিদারের : শুনলাম সে গত যুদ্ধে সেপাই ছিল। এখন বিয়ে থা' করে সংসারী হয়ে এই চাকরী ও তার সঙ্গে পাহাড়ে চাষবাস করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল বা আগ্রহ নেই। বেশ আত্মতুষ্টির ভাব। বেচারা আমাদের পথের কষ্টের কথা শুনে খুবই মর্মাহত হয়েছে। সব সময়ে চেষ্টা করছে, কি ভাবে আমাদের সেবা করতে পারে। ওর ইচ্ছা আমরা সোজা-সুজি ডাকবাংলোতেই চলে আসি। তাকে বুঝিয়ে বললাম, তার নৌকাতে অন্ততঃ দুবারে সকলে ওপারে যেতে যে সময় লাগবে ততক্ষণ না খেয়ে অপেক্ষা করার মত শরীরের অবস্থা কারুরই নেই, তাই ধর্মশালাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আধঘণ্টা বোট হাউসে অপেক্ষা করে, বৃষ্টি একটু কমলে তিনজনে নৌকায় করে ধর্মশালায় রওনা হলাম। হ্রদের মাঝামাঝি ডান দিকের কিনারে জলের মধ্যে থেকে ওঠা পাহাড়ের গায়ে এক গুহা দেখিয়ে চৌকিদার বলে, ওখানে এক সাধুবাবা থাকতেন, তিনিই ধর্মশালাটা বানিয়েছেন। বছর দুই হল তিনি কোথায় চলে গেছেন। গুহাটার নাম 'গনেশ গুম্ফা'। পাহাড়ীরা গুহাকে বলে গুম্ফা। একমাত্র কিস্তির সাহায্য ছাড়া ওই গুম্ফাতে যাবার কোনও

উপায় নেই। গুহামুখ জলের ঠিক উপরে হলেও, শুনলাম ভেতরে অনেকটা প্রশস্ত স্থান আছে। গুহার আশেপাশে জলের মধ্যে এক জাতীয় বেলেহাঁস চরছে, এরা বলে জলমোরগ। সাহেবদের রসজ্ঞানের তারিফ না করে পারি না। সুন্দর স্বাস্থ্যকর মনোরম পাহাড়-পর্বতে ঘেরা হ্রদের তীরে সুসজ্জিত ডাকবাংলো—বাগানে ফুল-ফল ও সব্জী, জলে—ট্রাউট মাছ ও জল মোরগ, জঙ্গলে—হরিণ। শুনতে পাই, স্বাধীনতার পরে এখন আর বড় একটা কেউ এখানে আসেন না। শুধু সরকারী কর্মচারীরা কদাচিৎ আসেন। আমার মনে হয়, যাঁরা প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াতে যেতে চান, অথচ লোকের ভীড় পছন্দ করেন না তাঁদের কাছে এস্থান খুবই ভালো লাগবে। তাছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এজায়গা ৫৬০০ ফুট উঁচু হওয়ায়, বছরের সব সময়েই বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তবে এখানে যাবার আগে পউরী অথবা চামোলীতে বন-বিভাগের অনুমতি নিয়ে যেতে হয় ডাকবাংলোতে থাকার জন্য। নিকটের গ্রামে চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি পাওয়া যায় জ্বালানীরও কোন অভাব নেই। ট্রাউট মাছ ধরবার জন্য কোন অনুমতি নিতে হয় না। শুধু ধরে দেবার মজুরী দিতে হয়। মে জুন মাসে আবার আসার জন্য লাল সিং আমাকে বারবার অনুরোধ করে।

বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই নৌকায় চড়ে ফিরে আসি এপারে। একে বৃষ্টি তার সঙ্গে বরফ ছোঁয়া হিম ঠাণ্ডা। কন্‌কনে তীব্র হাওয়া হাড়ের মধ্যে থেকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। ধর্মশালার ঘাটে নৌকা বেঁধে উঠে আসি উপরের ঘরে। অল্পক্ষণেই স্টোভে রান্না হয় ট্রাউট মাছের ঝোল। ডলুমায়ের হাতের অপূর্ব রান্না সুস্বাদু মাছের ঝোল, ডাল ও ভাত। কাঁচা টমাটোর টুকরা দিয়ে খেয়ে দেহে যেন প্রাণ ফিরে পাই।

এদিকে বৃষ্টি ক্রমশঃ তীব্রতর বেগে নেমে আমাদের ওপারে গিয়ে ডাক-বাংলোতে রাত কাটানোর সব ব্যবস্থা বানচাল করে দিল। ধর্মশালার দোতলায় একটা ঘরে সবাই মিলে আশ্রয় নিয়েছি। সেই ঘরের একপ্রান্তে রান্না হচ্ছে। কাঠ ও শ্লেট পাথরের তৈরী ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল ঘরে আসছে। একটা তাঁবু মাথার ওপরে খাটিয়ে কোন রকমে জল পড়া বন্ধ করে, ভাঙ্গা দরজাটা জিনিসপত্র দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চৌকিদার লাল সিং চলে গেল, কিছু আটা ও কেরোসিন তেল আনতে। আমাদের পাশের ঘরে কুলিরা আশ্রয় নিয়েছে। ট্রাউট মাছের ভাগ তাদেরও দেওয়া হল।

গ্রাম্য লোকটি মাছ ধরার পারিশ্রমিক পেয়ে খুশী হয়ে চলে গেল। যাবার সময় লাল সিং বলে গেছে সে ফিরে এসে আমাদের মাছ রেঁধে খাওয়াবে।

খাওয়া সেরে সবাই মিলে কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রবল শীতে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করি। সন্ধ্যার অল্প আগে বৃষ্টি থামল। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকের শোভা দেখি। ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টির শিখরদেশ মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। দূরবীন দিয়ে আমরা সেই বরফে প্রতিফলিত রক্তসন্ধ্যা উপভোগ করি। গোণাতালে বরফের শোভা দেখা যায় কেবলমাত্র ধর্মশালার দিক থেকেই। ডাকবাংলোয় গেলে পেছনের পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। যাক্ এইটুকুই আমাদের লাভ। কিন্তু চারিপাশের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যে একমাত্র এই দিকটাই খোলা থাকায় বরফ ছোঁওয়া উত্তুরে হাওয়াও কেবল এই দিকে তীব্রভাবে বয়ে চলেছে সর্বক্ষণ। এই কারণেই সাহেবরা ওপারে ডাক-বাংলোর স্থান নির্বাচন করেছিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে, সেই সঙ্গে নেমে আসে দুরন্ত শীত। বিখ্যাত গিরি শিখর ত্রিশূল পর্বতের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে ৫৬০০ ফুট ওপরে এই হ্রদ। তার ওপরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের ফলে শীতের তীব্রতা যেন ঘাংরিয়ার জঙ্গলকেও হার মানায়। সবাই মিলে ঘরের মেঝেতে পাতা বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়ে বসি। পাশের ঘরে আমাদের রাতের খাবার রাঁধছে লাল সিং, কুলিরা রুটি বানাচ্ছে তাদের নিজস্ব প্রথায়। পাহাড়ীদের এই রকম মোটা আধ কাঁচা রুটি খাওয়া আমার প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে এই তিন সপ্তাহে, জানি না আমার সহযাত্রীদের কেমন লাগবে।

এক পেয়ালা করে গরম কফি খেয়ে, সবাই মিলে ঘিরে বসি নির্মলদাকে। তিনি অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করেন। সুমিষ্ট অথচ বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে নিজস্ব বিশিষ্ট ছন্দে তাঁর সেই আবৃত্তি বহুক্ষণ ধরে উপভোগ করি। স্থান, কাল ও পাত্রের অপূর্ব সমন্বয়ে, গোণাতালের তীরে সেই সন্ধ্যা দীর্ঘদিন আমাদের মনে সুখস্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকবে।

রাতের খাওয়া আটটার মধ্যেই সাঙ্গ হল। চৌকিদারের রাঁধা ট্রাউটের ঝোল আর দোতিয়ালদের তৈরী রুটি বিশেষ রুচিকর। ট্রাউট মাছে একটিমাত্র কাঁটা, দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের ফলুই মাছের মত। অতি সুস্বাদু ও মিষ্টি মাছ। লাল সিংয়ের রান্নাও খুব সুন্দর। প্রায় অপরাহ্ণে দুপুরের আহার

হয়েছে। জল হাওয়ার গুণে ঘরে বসেও সন্ধ্যার পরেই আবার প্রচুর ক্ষুধার উদ্রেক হতে কোনই অসুবিধা হয় নি।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের তীব্রতা ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠে। ধর্মশালার জীর্ণ ঘর। সব গরম জামা-কাপড় পরে কম্বলের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ি। শীত যেন কিছুতেই কমতে চাইছে না। চৌকিদারের কথা শুনে ডাকবাংলোতে চলে গেলে এই কষ্টভোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো। কিন্তু এবারে অনুমতিপত্র থাকা সত্ত্বেও আমাদের ডাকবাংলোতে বাস করা হল না। নিতান্ত অদৃষ্ট ছাড়া এজন্য আর কাউকে দোষারোপ করা যায় না।

নির্মলদার ডাকাডাকিতে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কথাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকে হ্রদের জল এক অপূর্ব সুন্দর রূপ ধরেছে। একেবারে পরিষ্কার আকাশে, ঠিক সামনে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ত্রিশূল পর্বতের শ্বেতশুভ্র শিখরদেশ, পাশে নন্দাঘুন্টি। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে বহুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই শোভা দেখি। যা চেয়েছিলাম, সবই পেলাম, শুধু সেই সঙ্গে পেয়েছি অশেষ কষ্ট। কিন্তু কষ্ট ছাড়া তো কেষ্ট লাভ হয় না। দুঃখ না করলে সুখী হওয়া যায় না। তবে দুঃখের চেয়ে সুখ বড়। এ সুখ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়।

॥ ২০ ॥

প্রত্যাবর্তন

শেষ পর্যন্ত কুয়ারী গিরিবর্ত্ম যাত্রা স্থগিত রইল। পরদিন সকালে খবর পেলাম, কেলিয়াঘাট অর্থাৎ ডাকবাংলোর পেছন দিয়ে কুয়ারী গিরিবর্ত্মে যাবার পথ অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে অগম্য। এদিকে শীতের জন্য কাল রাতে একেবারেই ঘুম হয় নি। তাই মাতৃজঠরের শিশুর মত কম্বলের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলের তলা থেকেই হাত বাড়িয়ে এক কাপ চা হাতে নিলাম। চা খেয়ে শরীরের জড়তা কাটাই। অনেক কষ্টে বাইরে বেরিয়ে মুখহাত ধুয়ে ধীরে সুস্থে গোছগাছ সেরে প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রস্তুত হই।

ধর্মশালার উঠানে রোদের মধ্যে বসে আছি চৌকিদারের অপেক্ষায়। ধর্ম-শালার পেছনের পাহাড়ের প্রায় মাথায় এক জোড়া ছোট হরিণ লাফাতে লাফাতে

ওপাশে চলে গেল। কস্তুরী মৃগ হওয়া সম্ভব। মহাকবি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভবের' বর্ণনা মনে পড়ে—

"প্রস্থং হিমাদ্রেমৃগনাভিগন্ধি কিঞ্চিৎ ক্বণৎ কিন্নরমধ্যুবাস।
গণা নমেরুপ্রসবাবতংসা ভূর্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃশিলাবিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু॥"

[সেই স্বত্বপ্রধান স্থানে মৃগগণ নির্ভয়ে ইতস্তত ক্রীড়ারত ও মৃগনাভি-সৌরভে সমগ্র সানুদেশ আমোদিত এবং কিন্নর-কিন্নরীগণের মধুর কণ্ঠসঙ্গীতে সেই সানুর সমস্ত বনভূমি মুখরিত। এইরূপ স্থানে নির্বিকার শঙ্কর সমাধিস্থ হইলেন। শিব যখন সমাধিস্থ, তখন তাঁহার অনুচর প্রমথগণ শীতল ও মসৃণ ভূর্জবল্কল পরিধান-পূর্বক শরীর জুড়াইত এবং সুগন্ধি গৈরিকচূর্ণে দেহ বিলিপ্ত করিয়া শিলাজতু-সুরভি শিলাতলে কখন বসিত কখনও বা উঠিত]

বেলা আটাটা নাগাদ চৌকিদার লাল সিং কিস্তি বেয়ে এপারে এসে বৌদিকে একটা ধূসর রংয়ের জংলা ভেড়ার চামড়া উপহার দিল। এই প্রাণীটার স্থানীয় নাম 'বোঢ়াল'। বেচারা লালসিং আজ আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে—তার মুখে ম্লান হাসি। শেষবারের মত গোহণার সবুজ রংয়ের জলের দিকে ফিরে তাকাই। আজ আকাশ পরিষ্কার, প্রচুর রোদ উঠেছে। ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টির শিখরদেশ কিন্তু ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। গতকাল রাতে আমাদের দর্শন দিয়ে আজ তারা অদৃশ্য রয়েছে। লাল সিংয়ের কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করি বেলা সাড়ে আটটায়। আজ ১২ই অক্টোবর।

মৈথানা পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাথরের ধস ডিঙ্গিয়ে আমরা চলেছি ফিরে। বিরেহী গঙ্গা আগে আগে চলেছে, আমাদের পথ দেখিয়ে। আজ আর কোন কৌতূহল নেই, উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই। নেই কোন উদ্বেগ। শ্রান্ত ক্লান্ত যাত্রী ফিরে চলেছে ঘরে। মুক্ত বিহঙ্গ পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হবে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। দু পাশের পাহাড়ে দেওদার, ঝাউ প্রভৃতি বড় বড গাছ। অল্প অল্প হাওয়া, নীল আকাশে মুঠো মুঠো মেঘ। পাহাড়ী এক ব্যাধ চলেছে শিকারে। পিঠে গাদা বন্দুক, কাঁধে একটি দু তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে—ব্যাধের বুকের ওপরে তার ছোট্ট পা দু খানি ঝুলিয়ে বসে আছে। লাল টুকটুকে গাল দুটি তুলোর মত নরম। ব্যাধকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, শিকারই তার জীবিকা। এখানে বাঘ, ভালুক (রিখি), হরিণ প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। এখন সে চলেছে শিকারে, দিনের শেষে শিকার নিয়ে ঘরে ফিরবে।

ছোট্ট মেয়েটাও ঘুরবে বাপের সঙ্গে সারাদিন। ব্যাধের গৃহিণী সংসারের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থেকে দিনান্তে স্বামী ও কন্যার অপেক্ষায় বসে থাকবে। বিরেহী-গঙ্গার উপত্যকার পটভূমিকায় রচিত মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'কুমার-সম্ভবে' আছে—

"ওদিকে ভ্রমিছে বারণ চণ্ড দেবদারু-দেহে ঘর্ষি গণ্ড,
মদ সুগন্ধি ঘন নির্য্যাসে মাতিছে বনস্থলী।
সহসা কেশরী ঘোর হুঙ্কারী নখাঘাতে করিকুম্ভ বিদারি,
পথে পথে গজমুক্তা ছড়ায়ে নির্ভয়ে যায় চলি।
মুকুতা-চিহ্নে সন্ধান বুঝি' ফিরিছে কিরাত মৃগরাজে খুঁজি,
মৃগয়া অন্তে শ্রান্তি জুড়ায় গিরিগঙ্গার তটে।
ঝিরি ঝিরি বহে শীত সমীরণ নিঝর-শীকর করিয়া হরণ,
সারা অরণ্যে তুলি' শিহরণ মৃদু মর্ম্মর রটে।
দুলে দেবদারু শীতবায়ুভরে শিখিশিরে চূড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে,
মনে পড়ে যায় বনকুটীরের একাকিনী প্রিয়াটিরে।
ঘরে ফিরে চলে বেড়ে যায় রাতি কুঞ্জ শয়নে জাগিছে কিরাতী
বাসরের বাতি জ্বলে স্বপ্রভ ঔষধির শিরে শিরে॥"

(যতীন সেনগুপ্ত)

কবির মানস নয়নে নগাধিরাজ হিমালয়ের বিশাল বিস্তার, বিপুল উচ্চতা ও সুগভীর রহস্যে উদ্ভাসিত। দৃশ্যের পর দৃশ্য, চিত্রের পর চিত্র প্রতিফলিত হইয়া চলিয়াছে। চিরধবল তুষারমৌলী উত্তুঙ্গ গিরিশিখর, তাহারই অঙ্কে মারুত-পূর্ণ-রন্ধ্র-কীচক বনে কাহার বাঁশী বাজে! এদিকে করিগণ্ড-ঘর্ষণ ক্ষরিত দেওদার-দেহ-নির্যাসের মদগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত; ওদিকে চাহিও না—বুঝি ত্রস্ত বাসনা কিন্নরী গুহান্তরালে প্রিয়তমের আলিঙ্গনবদ্ধ। কিরাত ফিরিতেছে শৈলশিখরে সিংহ শিকার করিয়া, বাতাস ফিরিতেছে শিখিশিরে চূড়াগুচ্ছ নাচাইয়া। কোথাও তপস্যারত সিদ্ধ তাপস, কোথাও কেশবিন্যাসরত অপ্সরাগণ। গুহায় গুহায় অন্ধকার লুকাইয়া আছে, বনে বনে ওষধিশিরে অতৈলপূর প্রদীপ জ্বলিতেছে। কবি আপনার মনে গান গাহিয়া চলিয়াছেন, আর শ্রোতা যেন এক মায়ারাজ্যে কোন বিরাটের, কোন অপরূপ সুন্দরের স্বপ্ন দেখিতেছে।

(কুমারসম্ভব)

আজ বিরেহী গঙ্গার ধারে হিমালয়ের ঘন জঙ্গলের পথ ধরে চলতে চলতে আমরা আলোচনা করছি যুগে যুগে কবিদের গানে চিরসুন্দর মহাশৈল হিমবান হিমালয়ের বর্ণনা। আজ আর আমাদের কোন তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে চারিদিকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পথ চলেছি। দিনের আলোতে পাহাড়ী বড় বড় ঝর্ণা নদী ও বিরাট বিরাট ধস পার হতে আজ আর কষ্ট হয় না। বিরেহী নদী কখনও বিশাল, কখনও দু পাশের উন্নত পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথে, বিপুল বেগে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখি পাহাড়ের গায়ে প্রায় সমতল পশুচারণভূমি, এরা বলে 'খারক' যার ইংরাজী নাম 'Alp'। কুমায়ুনে বরফের সীমানার মধ্যে ১৩০০০।১৪০০০ ফুট উঁচুতে এমনি খারককে বলে 'বুগিয়াল'। সেখানে ঘাস জন্মায় বছরের অধিকাংশ সময়ে। পাহাড়ী পশু-পালকরা সেখানে তাদের ভেড়া, ছাগল চরায়। প্রকৃতি সব জায়গাতেই সকলের জন্য খাবার সংস্থান করেছে।

পথে একটা ঝরণার ধারে বসে, আগের রাতের নেপালী দোতিয়ালদের তৈরী রুটি ও আলুর তরকারী খেয়ে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী শসা চিবুতে চিবুতে আবার পথ চলি। মাঝে এক জায়গায় পথের ধারে বসে স্টোভ জ্বালিয়ে চা ও শুকনো চিড়ে খেয়ে নিই।

বেলা সওয়া তিনটায় বিরেহীতে এলাম। পুলের ধারে দোকানে এসে বসা গেল। চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে নিচের পথের বাসের জন্য অপেক্ষা করি। বেলা প্রায় চারটের সময় পিপলকোঠী থেকে বাস এল। শেষ গেটের এই বাস আজ কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত যাবে।

চামোলী ও নন্দপ্রয়াগে সামান্য সময় দাঁড়িয়ে আমাদের মোটরবাস কর্ণ-প্রয়াগে এল সন্ধ্যা সাতটার পরে। বাস রাস্তার পাশের হোটেলগুলো আজ পরিপূর্ণ, শোবার জায়গা মিলবে না। অগত্যা কুলিদের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে চলি পাহাড়ের উপরে, বাজারের মধ্যে কালি-কমলি ধর্মশালায়। ধর্মশালার সামনে গোটা রাস্তাটা জুড়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে মস্ত সভা চলেছে। নেতারা সব এসেছেন, স্থানীয়রা বসে রয়েছেন। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গান্ধীটুপি পরিহিত জনৈক নেতা বক্তৃতা করছেন। কোন রকমে ভীড় ঠেলে ধর্মশালার দোতলায় উঠি। একটা ঘর যোগাড় করে আবার ছুটতে হয় কিছু খাবারের সন্ধানে। সবাই বিশ্রাম চায়, ছোট মেয়েটা বিশেষ ক্লান্ত।

ধর্মশালার সামনে একটি মাত্র মিঠাইয়ের দোকান ছাড়া বাজারের সব

দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাত আটটাও বাজে নি। বাজার বন্ধ হয়েছে জনসভার জন্য। সভা শেষে এখন রাস্তায় পরদা টাঙিয়ে হিন্দী সবাক চিত্র দেখানো হচ্ছে। এ দোকানটি খোলা থাকার কারণ নিমন্ত্রিত নেতাদের জন্যে এখানে পুরি ভাজা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। নেতাদের খাওয়ানো সারা হলে অনেক বলে কয়ে কিছু পুরি ও পেঁড়া সংগ্রহ করে ধর্মশালায় ফিরে আসি রাত দশটায়। ধর্মশালার দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় গালিচা পেতে নিমন্ত্রিতদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁরা চলে যেতে মেঠাইয়ের দোকানদারকে বলে আর একখানা ঘরও সংগ্রহ করা গেল। দোকানদারই এই ধর্মশালার চৌকিদার, দরজার সামনেই তার ছোট্ট দোকান। বিনয়দা ও আমি অন্য ঘরটায শুয়ে ছারপোকার কামড অগ্রাহ্য করেই ঘুমিয়ে পড়ি।

॥ ২১ ॥

সারারাত ছারপোকারা রক্ত খেয়েছে। ভোর ছটায় শয্যাত্যাগ করি। খুব ভোরে বিনয়দা ও নির্মলদা পিণ্ডার ও অলকানন্দার সঙ্গমে স্নান করতে গিয়েছিলেন। আলসেমির জন্যে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আমি মনে মনেই নমস্কার করি শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীর কর্ণের তপস্যাধন্য এই পুণ্য প্রয়াগকে।

গতরাতের দোকান থেকে চা আনিয়ে খেয়ে বাঁধাছাঁদা সারতেই কুলিরা এসে পড়ল। কর্ণপ্রয়াগ ছাড়লাম বেলা পৌনে আটটায়।

অলকানন্দার তীর ধরে কঠিনবন্ধুর পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে মোটরবাস আমাদের নামিয়ে নিয়ে চলেছে সমতলের দিকে। উচ্চতা ক্রমে কমছে, সেইসঙ্গে গরমও বাড়ছে। বেলা নটায় 'গৌচর', সাড়ে নটায় 'ঘোলতীর', সাড়ে দশটায় 'রুদ্রপ্রয়াগ'। আরও প্রায় দুই মাইল এসে, রাস্তার ধারে 'গোলাব রায় চটি'। একটা আমগাছের গায়ে সাইনবোর্ড আঁটা আছে—বিখ্যাত শিকারী জিম করবেট্ ঐ আমগাছটার তলাতেই সেই রুদ্রপ্রয়াগের চিতা বা 'দি ম্যান-ইটিং লেপার্ড অভ্ রুদ্রপ্রয়াগ'কে মেরেছিলেন। চিতা বাঘটা দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব করে, বহু লোকের প্রাণহানি করেছিল। অনেক চেষ্টায় জিম করবেট্ চিতা বাঘটাকে মারতে পেরেছিলেন।

বেলা সাড়ে এগারোটায় 'কল্যাসহর'। এখানে বাস অফিসে আজকের বাসযাত্রার টিকেট করতে হল, কর্ণপ্রয়াগ থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত।

বেলা একটায় শ্রীনগরে এসে বাস বদল করে, রাস্তার কলে মুখহাত ধুয়ে পূর্বপরিচিত হোটেলে আসি 'মীটের' আশায়। দোকানী নিরাশ করে না। গরম বাসমতী চালের ভাত, ডাল, তরকারী ও মীট দিয়ে আপ্যায়ন করে আমাদের। শুনেছি এঅঞ্চলের 'রামজওয়ান' চাল নাকি 'বাসমতীর' চেয়েও পুষ্টিকর ও বলকারক। কিন্তু 'রামজওয়ান' এঅঞ্চলে উৎপন্ন হলেও দেরাদুনের আড়তদারেরাই কিনে নিয়ে যায়, ফলে এখানে কিছুই পাওয়া যায় না।

মাংসের বাটীটায় হাত ডুবিয়ে নির্মলদা বললেন, 'ওহে, ত্রেতা, দ্বাপর পার হয়ে আমাদের এই কলিযুগেও শ্রীনগর একটা উল্লেখযোগ্য স্থান।' ইতিহাসের সর্বোচ্চ উপাধিধারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র নির্মলদা। খেতে খেতে তাঁর কাছ থেকে শুনলাম গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। মধ্য হিমালয়ের এই সব অঞ্চল বহু বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন কি বিখ্যাত বা কুখ্যাত দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের ইতিহাস লেখক সেরাজুদ্দিনও এই অঞ্চল সম্বন্ধে লিখেছেন —"...the Persian Historian of Taimor, Serajuddin in the 15th century, conducting that conqueror as far as the entrance of the strait of Kupela says that, fifteen miles above this strait there is a stone cut in the shape of a cow, from whence the Ganges springs." ঋষিকেশের ঠিক ওপরকার গর্জের কথাই এখানে সেরাজুদ্দিন বলেছেন। "The curiosity of the Emperor Akbar was intrigued by the legend, and towards the end of the sixteenth century Akbar sent a special mission of exploration, which benefited the neighbourhood of Gangotri."

তারপরে সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) Antonio-de-Andrade আগ্রা থেকে শ্রীনগর হয়ে নানা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে তিব্বতে যান। ইনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি মানস-সরোবর চর্মচক্ষে দেখেন।

Captain John Guthric ফরাসী বিপ্লবের বছর, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালে শ্রীনগরে যান জরীপের কাজে। তারপরে Mr. Daniel-ও যান সেখানে ঐ একই কাজে। এঁর আঁকা শ্রীনগর এবং এই সব অঞ্চলের ভালো স্কেচ আছে।

গত শতাব্দীর বিখ্যাত রাজপুতশৈলীতে পারদর্শী চিত্রকর মোলারাম শ্রীনগরে বাস করতেন। তাঁর আঁকা মধ্য হিমালয়ের ছবি বিদগ্ধসমাজে যথেষ্ট

সমাদর পেয়েছে। তাঁর নাতি বৈজনাথ তোমরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নির্মলদা শ্রীনগর বাজারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বৃটিশরা সার্ভেয়ার পাঠিয়ে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ভালভাবে জরীপ করে সীমান্তগুলি সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন। নেপাল, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যুদ্ধের আগেই তাঁরা ঐসব পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে প্রথমে ম্যাপ ইত্যাদি প্রস্তুত করে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন। আর তারপর যুদ্ধের ফলাফলটা তো সকলেরই জানা আছে। লেফ্‌টেনেন্ট ওয়েবকে (Lt. Webb) হরিদ্বার—ঋষিকেশ থেকে পূর্বাঞ্চলের তিস্তাভ্যালী পর্যন্ত সমুদয় পার্বত্যঅঞ্চলের জরীপের ও নক্সা তৈরীর ভার দেওয়া হয়। লেঃ ওয়েবের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে হিয়ারসে (Hearsey) তাঁর তৈরী নক্সা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে ইংলণ্ডে চালাবার চেষ্টা করেন, পরে ধরা পড়ে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। এই Hearsey তদানীন্তন গাড়োয়াল রাজের কাছ থেকে দেরাদুনের বিস্তীর্ণ এলাকা জায়গীর লাভ করেন, অবশ্য সেটা পরে নাকচ হয়ে যায়। তারপর 'পুসার' (Pusa) পশু চিকিৎসক মুরক্রফ্‌টের (Moorecroft) সঙ্গে জুটে Hearsey তিব্বতে যান ছদ্মবেশে। মুরক্রফ্‌ট্‌ এর নাম 'মায়াপুরী' এবং Hearseyর নাম হয় 'হরগিরি'। উদ্দেশ্য তিব্বতী ঘোড়া এবং লম্বা লোমওয়ালা ভারবাহী ছাগল সংগ্রহ করা। সেখানে তাঁরা ধরা পড়েন এবং তিব্বতীরা তাঁদের দুজনকে 'দাবাজঙ্গে' (Dabajang) বন্দী করে রাখে। তাঁদের উদ্ধার করবার জন্যে শ্রীনগর থেকে কিষেন সিং, তাঁর পিতা দেব সিং এবং খুল্লতাত বীর সিং দাবাজঙ্গে গিয়ে তাঁদের মুক্তিপণ হিসাবে এই শ্রীনগরের ওপরে একহাজার টাকার হুণ্ডি কাটেন।

বস্তুতঃ সেদিন পর্যন্ত অলকানন্দাভ্যালীর ভেতর দিয়ে এইসব পার্বত্য অঞ্চলের যাওয়ার শেষ শহর ছিল এই শ্রীনগর।

নির্মলদারা চলেছেন পউরী হয়ে কোটদ্বার। আমি ফিরে চলেছি কলকাতায়। সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এসে উঠলাম ঋষিকেশের বাসে। বাস ছাড়ল বেলা পৌনে দুটায়। কীর্তিনগরের ঝোলাপুলে এযাত্রায় টোল দিতে হল, কারণ আমি বাসের টিকেট শ্রীনগর থেকে করেছি। মাথাপিছু কুড়ি নয়া পয়সা পার হবার দক্ষিণা। বেলা সাড়ে তিনটায় দেবপ্রয়াগ। মেঘমুক্ত শরতের আকাশে বিকেলের পড়ন্ত রোদ। গঙ্গার বিশাল চওড়া নদীগর্ভে পাথরের নুড়ি বিছানো বিস্তীর্ণ দুই তীর অপরূপ শোভা ধারণ

করেছে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস আপনিই বেরিয়ে আসে। ছবি তুলতে না পারার দুঃখ সহজে যাবার নয়। যাবার সময় বৃষ্টির জন্য, আর এখন ক্যামেরার অভাবে অনেক ভালো ভালো দৃশ্যের ছবিই তোলা হল না।

এই মর্তের স্বর্গ ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিন্তু তবু ফিরে যেতে হয়। মনকে প্রবোধ দিই আবার আসব, বারে বারে এসে ঐ অমৃতবারি আকণ্ঠ পান করে দেহমন পবিত্র করব। এই ত আমার জীবনের লক্ষ্য, আমার রক্তের ঐতিহ্য, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার। ঐ অমৃতবারি আমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভক্তিকে প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালিত করবে। আমার ঐকান্তিক নিষ্ঠা আমায় নিয়ে যাবে ব্রহ্মলোকের দিকে, মহাভারতের আদর্শে।

— শেষ —

সংক্ষিপ্ত পথপঞ্জী

	কলকাতা	থেকে	দেরাদুন	রেলপথে	— ৯৪৭	মাইল
	”	”	ঋষিকেশ	”	— ৯২৯	”
	দেরাদুন	”	”	বাসপথে	— ২৬	”
	হরিদ্বার	”	”	”	— ১৪	”
† *	ঋষিকেশ	”	দেবপ্রয়াগ	”	— ৪৪	”
† *	দেবপ্রযাগ	”	শ্রীনগর	”	— ২১	”
† *	শ্রীনগর	”	রুদ্রপ্রয়াগ	”	— ১৮	”
† *	রুদ্রপ্রয়াগ	”	গৌচর	”	— ১৪	”
	গৌচর	”	কর্ণপ্রয়াগ	”	— ৬	”
† *	কর্ণপ্রয়াগ	”	নন্দপ্রযাগ	”	— ১৩	”
† *	নন্দপ্রয়াগ	”	চামোলী	”	— ৭	”
‡ † *	চামোলী	”	পিপলকোঠী	”	— ১১	”
† *	পিপলকোঠী	”	জোশীমঠ	পাযে চলা পথে	— ২০	”
‡ † *	জোশীমঠ	”	গোবিন্দঘাট	” ”	— ৮	”
	জোশীমঠ	”	পাণ্ডুকেশ্বর	” ”	— ৯	”
‡ † *	পাণ্ডুকেশ্বর	”	হনুমান চটি	” ”	— ৭	”
	হনুমান চটি	”	বদরীনাথ	” ”	— ৫	”
‡	গোবিন্দঘাট	”	ঘাংরিয়া	” ”	— ৭	”
‡	ঘাংরিয়া	”	হেমকুণ্ড	” ”	— ৩॥০	”
	ঘাংরিয়া	”	নন্দনকানন	” ”	— ২॥০	”
	চামোলী	”	বিরেহী	বাসপথে	— ৫	”
‡	বিরেহী	”	গোণাতাল	পাযে চলা পথে	— ৯/১০	”

‡ ফরেষ্ট রেস্ট হাউস

† পোস্ট-অফিস

* ডাকবাংলো

উপরোক্ত প্রত্যেকটি-স্থানে (বিরেহীবাদে) ধর্মশালা, চটি ও খাবার দোকান আছে।

পরিশিষ্ট

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

(আশ্বিনের জন্য)

১। জামা কাপড়—

গরম প্যাণ্ট—১টা।
„ কোট অথবা জ্যাকেট—১টা।
„ আণ্ডার ড্রয়ার (পুরা)—১টা।
„ মাফ্‌লার—১টা।
„ দস্তানা—১ জোড়া।
সুতী প্যাণ্ট—১টা।
„ ধুতি অথবা পায়জামা—১টা।
„ গামছা বা তোয়ালে—১টা।

গরম সোয়েটার—১টা।
„ গেঞ্জি (পুরাহাতা)—১টা।
„ বালক্লাভা টুপী—১টা।
„ মোজা—২ জোড়া।
„ চাদর— টা।
সুতী ফুলহাতা সার্ট—২টা।
(একটা কটস উলের হলে ভাল হয়)
সুতী গেঞ্জি ও ইজার—২টা।
„ রুমাল—২টা।

বর্ষাতি (প্লাস্টিকের হালকা) ১টা টুপী সমেত

বাটা কোম্পানীর গলফ শু ১ জোড়া (এক সাইজ ঢিলা)

জল ছাঁকিবার জন্য কিছু পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা, জলের বোতল (এ্যালুমিনিয়াম) লাঠি ছুরী, টর্চলাইট, একটা এনামেল মগ, চামচ, তেল, সাবান।

২। বিছানা—

সতরঞ্চী—১টা।
কম্বল—৩টা। (অথবা স্লিপিং ব্যাগ)

সুজ্‌নী—১টা।
বালিশ—১টা।

বিছানা ও ব্যাগ জড়াইবার জন্য পাতলা পলিথিন শীট—২ গজ, কিছু দড়ি। এয়ার ম্যাট্রেস অথবা নিচে পাতিবার কম্বল একটা।

৩। ঔষধপত্র—

এল্‌কোসিন, নোভালজিন, সাল্‌ফাগুয়ানাডাইন, এন্‌টারোভায়োফর্ম, এ্যানাসিন, ডেটল, তুলো, লিউকোপ্লাস্ট, কোল্ডক্রীম।

৪। খাবার—

চা, চিনি, কফি, গুঁড়াদুধ, চিঁড়া, বাদাম, কিস্‌মিস্‌, পিপারমেণ্ট লজেন্স।

ঘর বন্ধ করিবার জন্য একটা ভাল তালা সঙ্গে থাকিলে ভাল হয়।

খরচ-পত্র

(১৯৬২ সালের হিসাব)

১। কলিকাতা—দেরাদুন যাতায়াত রেলভাড়া—তৃতীয় শ্রেণী—৪৮'০০ নঃ পঃ
(তিন মাসের জন্য হিল-কন্‌সেসন ও স্লিপার কোচের
সুবিধা যুক্ত। যাইবার সময় হরিদ্বারে নামা যায়)

২। হরিদ্বার—ঋষিকেশ বাসের ভাড়া — — '৯১ নঃ পঃ

৩। ঋষিকেশ—জোশীমঠ „ „ যাতায়াত (আপার) ৩৫'০০ নঃ পঃ
„ „ „ „ „ (লোয়ার) ২৭'০০ নঃ পঃ

৪। মজদুর রেট—
মোট বাহক-দুইধাম (ক) কেদার ও বদরী
(খ) বদরী ও হেমকুণ্ড নন্দনকানন } প্রতি ১০১'০০ নঃপঃ
(গ) যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী

(মাল এক মণের বেশী হইলে অতিরিক্ত প্রতি সের আড়াই টাকা হিসাবে)

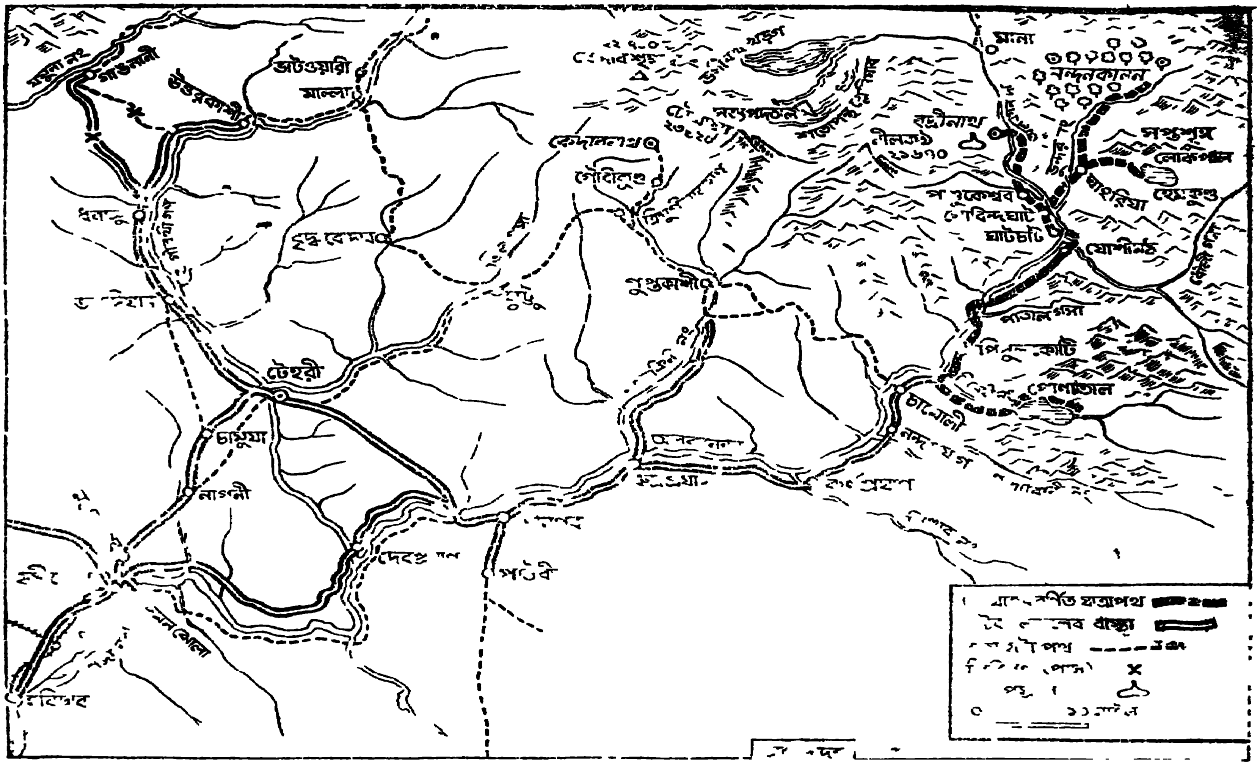
কাণ্ডী—(ক) ১২ বৎসরের কম বালক বালিকা— ১১১'০০ নঃ পঃ
(খ) পূর্ণ বয়স্ক লোক— ১৩১'০০ নঃ পঃ
ডাণ্ডী—(ক) চারজন বাহকসহ— ৩৩৪'০০ নঃ পঃ
(খ) ছয়জন -- ৫০২'৫০ নঃ পঃ

কাণ্ডী ও ডাণ্ডীর মূল্য অথবা ভাড়া স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—ঋষিকেশের তীর্থযাত্রা মজদুর এজেন্সি হইতে চুক্তিপত্র সহি করিয়া মোট বাহক বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। যতদূর পর্যন্ত মোটরবাস চলে, তাহারা নিজ খরচে সঙ্গে যায়। অবশ্য রুদ্রপ্রয়াগ, চামোলী, জোশীমঠ হইতেও মজদুর পাওয়া যায়। তবে অবস্থা বুঝিয়া ঐ স্থানে দুর্লভও হইতে পারে। যে কোনও একটা ধামের অথবা একসঙ্গে চার ধামের জন্য টাকার ব্যবস্থাও এক যাত্রায় সম্ভব।

৫। বাসস্থান—পথে সর্বত্র ধর্মশালায় ও চটিতে আশ্রয় পাওয়া যায়। পূর্ত ও বনবিভাগের ডাকবাংলোতে ঘর প্রতি দৈনিক ২৲ টাকা (পূর্বে অনুমতি লইতে হয়) আজকাল চটিতে কোথাও কোথাও ঘরভাড়া চায়।

৬। আহার—হোটেলে প্রতি বেলা আহার— ১'০০ নঃ পঃ/১'২৫ নঃ পঃ
„ „ গেলাস চা — '১২ নঃ পঃ
„ „ „ দুধ — '২৫ নঃ পঃ/'৫০ নঃ পঃ



গাঙনানী
উত্তরকাশী
ভাটওয়ারী
মাল্লা
কেদারনাথ
গৌরীকুণ্ড
বদ্রীনাথ
নীলকণ্ঠ
মানা
নন্দনকানন
সপ্তশৃঙ্গ
লোকপাল
হেমকুণ্ড
যোশীমঠ
ঘাটচটি
গোবিন্দঘাট
পাতালগঙ্গা
চামোলী
গোপেশ্বর
টেহরী
চাম্বুয়া
নাগনী
দেবপ্রয়াগ
ধরাসু
গুপ্তকাশী
হৃষিকেশ